Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তান এর উপর পিতামাতার দায়ীত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আবিদা আরিফা হোসাইন

রোলঃ 228021462

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তান এর উপর পিতামাতার দায়ীত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আবিদা আরিফা হোসাইন

রোলঃ 228021462

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সন্তান এর উপর পিতামাতার দায়ীত্ব ও কর্তব্য ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আবিদা আরিফা হোসাইন, আইডিঃ 228021462 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সন্তান এর উপর পিতামাতার দায়ীত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

আবিদা আরিফা হোসাইন

আইডিঃ 228021462

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

নবী ﷺ বলেন:

"কোনো পিতা তার সন্তানকে উত্তম আদব বা উত্তম চরিত্রের চেয়ে উত্তম কিছু দান করতে পারে না।"

— *[জামে' তিরমিযী, হাদীস: ১৯৫২]*

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও পালনকর্তা I **আল্লাহর ক্ষমতা অসীম, অনন্ত, এবং অপরিসীম।** তিনি সেই সত্তা, যিনি কোনো কিছুর ওপর নির্ভরশীল নন, বরং সমগ্র সৃষ্টিজগৎই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। তাঁর হুকুমে আকাশ ও পৃথিবী টিকে আছে, তাঁর ইচ্ছাতেই দিন ও রাতের আবর্তন ঘটে। বিশাল আকাশমণ্ডলী তাঁর সৃষ্টির একটি ক্ষুদ্র নিদর্শন মাত্র, আর অনন্ত মহাবিশ্বের প্রতিটি কণা তাঁর অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতার সাক্ষ্য দেয়। তিনি যখন বলেন **"হও"**, তখন তা সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তবে রূপ নেয়—**إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** *"তাঁর আদেশ এমনই যে, যখন তিনি কোনো কিছু চান, তখন কেবল বলেন 'হও', আর তা হয়ে যায়।"* (সূরা ইয়াসিন: ৮২)

আল্লাহর শক্তির সামনে পাহাড় কেঁপে ওঠে, মহাসমুদ্র বিনীত হয়, সূর্য-চন্দ্র তাঁর ইচ্ছার অধীন। তিনি অদৃশ্যকে প্রকাশ করেন, মৃতকে জীবিত করেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর শুকনো জমিনকে নতুন জীবনে ফিরিয়ে আনেন। মানুষের সীমিত জ্ঞান যেখানে শেষ, সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর অসীম কুদরত। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া একটি পাতাও নড়ে না, একটি বিন্দুও ঝরে না।

তাঁর রাজত্বে কেউ অংশীদার নয়, তাঁর শক্তির কোনো সীমা নেই, আর তাঁর করুণার কোনো শেষ নেই। তিনি পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল, কিন্তু একইসঙ্গে মহাশক্তিধর এবং ন্যায়পরায়ণ। তাঁর সামনে সমস্ত সৃষ্টি বিনীত হয়ে সিজদাবনত হয়, আর তাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্ত সত্য। **সকল মহিমা, সকল শক্তি এবং সকল গৌরব একমাত্র মহান আল্লাহরই জন্য I**

তিনি মানবজাতির হিদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, এবং তাদের মধ্য থেকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন।

সালাম ও দরুদ বর্ষিত হোক সেই মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি, যাঁর আগমনে পৃথিবী পেয়েছিলো সত্য, ন্যায় ও রহমতের পূর্ণতা—**আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)**। যিনি মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ, যাঁর চরিত্র আলো ছড়ায় চন্দ্রের চেয়েও উজ্জ্বলভাবে, যাঁর শিক্ষা অন্তরকে আলোকিত করে দীপ্তিময় সূর্যের ন্যায়।

হে প্রিয় নবী! আমাদের হৃদয়ের গভীর থেকে আপনার প্রতি শান্তি, সালাম ও অশেষ দরুদ নিবেদন করছি—

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللهِ(আপনার প্রতি

শান্তি বর্ষিত হোক, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে আল্লাহর নবী! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে আল্লাহর প্রিয়তম!)

আপনি ছিলেন অন্ধকারে আলো, পথহারা মানুষদের জন্য পথপ্রদর্শক। আপনার শিক্ষা আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের দিশারী। আমরা আপনার সুন্নাহকে ভালোবাসি, আপনার পথে চলতে চাই, এবং আপনার অনুসরণেই আমাদের সফলতা খুঁজে পাই।

হে আল্লাহ! আমাদের হৃদয়ে নবীজির ভালোবাসা দৃঢ় করুন, তাঁর সুন্নাহকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফিক দিন এবং কিয়ামতের দিনে আমাদের তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য দান করুন—

'সন্তান এর প্রতি মা বাবার দায়ীত্ব ও কর্তব্য 'যা বর্তমানে আমাদের সমাজ এ **'প্যারেন্টিং'** শব্দটি নাম এ ব্যপক আলোচিত বিষয় I

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক জীবনের জন্য নির্ভরযোগ্য দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

পরিবার মানবজীবনের প্রথম শিক্ষালয়, আর পিতামাতা হলেন সন্তানের প্রথম পথপ্রদর্শক। সন্তানদের সঠিক দিকনির্দেশনা, নৈতিক শিক্ষা ও সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠনের মূল দায়িত্ব পিতামাতার ওপর বর্তায়। ইসলাম ধর্মে যেমন পিতামাতার অধিকার গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সন্তানদের প্রতি তাদের দায়িত্বও অত্যন্ত গুরুতর।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

"তোমরা সবাই রাখাল, এবং তোমরা প্রত্যেকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে দায়িত্বশীল।" (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৮৯৩)

তবে আধুনিক যুগে প্রযুক্তির অগ্রগতি, সামাজিক পরিবর্তন ও তথ্যপ্রবাহের প্রসারের ফলে সন্তান লালন-পালনের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন এসেছে। "আধুনিক প্যারেন্টিং" বা আধুনিক অভিভাবকত্ব আজকের সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাপন, ডিজিটাল মাধ্যমের প্রভাব, কর্মজীবী পিতামাতার ব্যস্ততা–এসবই আধুনিক সময়ে সন্তানের নৈতিক ও মানসিক বিকাশে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। তাই ইসলামী শিক্ষার আলোকে আধুনিক যুগের অভিভাবকদের কিভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত, সেটি এই গবেষণায় বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হবে।

এই গবেষণা ইসলামী ও আধুনিক অভিভাবকত্বের মধ্যে একটি ভারসাম্য খুঁজে বের করতে সহায়ক হবে, যা একটি সুস্থ, নৈতিক ও আধুনিক মানসিকতার সমাজ গঠনে অবদান রাখবে।

পিতা-মাতা শুধু সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ নয়, বরং তাদের সঠিক শিক্ষা ও পরিচর্যা দেওয়াও তাদের ঈমানি দায়িত্ব। ইসলাম পিতা-মাতাকে সন্তানের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও শারীরিক বিকাশের দায়িত্ব দিয়েছে এবং এটি একটি পবিত্র আমানত হিসেবে গণ্য করেছে।

একটি সুস্থ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের জন্য সঠিক পারিবারিক কাঠামো প্রয়োজন, যেখানে পিতা-মাতা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন। ইসলামে পরিবার গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো সৎ, ধর্মপরায়ণ ও নৈতিক মানুষ তৈরি করা, যারা সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে।

তাই, এই মহান দায়িত্ব পালনের জন্য প্রত্যেকেরই সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যা আমরা কুরআন ও হাদিস থেকে পেয়ে থাকি।
যদি পিতা-মাতা সন্তান লালন-পালনের বিষয়ে সচেতন না হন এবং ইসলামি শিক্ষার অভাব থাকে, তবে তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবে না।
সন্তানের নৈতিকতা, ঈমান ও চরিত্র গঠনের জন্য পিতা-মাতাকে অবশ্যই কুরআন ও হাদিসের শিক্ষায় নিজেদের গড়ে তুলতে হবে এবং সঠিক পদ্ধতিতে সন্তানকে লালন-পালন করতে হবে, যাতে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারে।

পিতা-মাতার দায়িত্বের গুরুত্ব

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোরস্বভাব, কঠিনহৃদয় ফেরেশতাগণ। যারা আল্লাহর কোনো হুকুমে তাঁর অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়। -সূরা তাহরীম (৬৬ : ৬)

উত্তম তারবিয়াত পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক যেমন মাতা-পিতার খেদমত, ও সম্মান সন্তানের কর্তব্য তেমনি মাতা-পিতারও সন্তানের হকসমূহ আদায় করা কর্তব্য। এজন্যই জানা উচিত, তাদের উপর সন্তানের কী কী হক ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে এবং সন্তানের সাথে তাদের আচার-ব্যবহার কেমন হতে হবে। আর তাদের দ্বীনী তারবিয়াত কীভাবে করতে হবে। মূলত তাদেরকে দ্বীনী তারবিয়াত করা, পিতা-মাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। যে মা-বাবা সন্তানের দ্বীনী তারবিয়াতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করবেন তারা দুনিয়া-আখেরাত উভয়জগতে কামিয়াব হবেন। আর যে মা-বাবা সন্তানের দ্বীনী তারবিয়াত করবেন না তারা পরকালে জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন।

সন্তানের উত্তম শিক্ষাদান পিতা-মাতার উপর ফরয

আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতা-পিতার উপর সন্তানের উত্তম শিক্ষাদান আবশ্যক করে দিয়েছেন। আর যে বিষয় অবশ্য-পালনীয় তাতে কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছার এখতিয়ার থাকে না। হাঁ, নফল বা মুস্তাহাব কাজে সে এখতিয়ার থাকে। ফরয বা ওয়াজিব আদায় না করলে জবাবদিহি করতে হয়।

হযরত সাহবান মাহমুদ রাহ. স্বীয় কিতাব ‘তারবিয়াতে আওলাদ’-এর কারণ উল্লেখ করেন যে, সন্তানের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি তার বাল্যকাল থেকেই শুরু হয়ে যায়। সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে পিতা-মাতার উপর এই হুকুম বর্তায় যে, তাকে উত্তম তারবিয়াত কর।

এই জন্য পিতা-মাতা যদি সন্তানকে বাল্যকাল থেকেই উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা না দেয় এবং সন্তান এভাবেই তরবিয়াতহীনভাবে বেড়ে ওঠে, পরে শরীয়তের মুকাল্লাফ হওয়ার পর তার থেকে গোনাহ প্রকাশ হতে থাকে তাহলে মাতা-পিতার অবহেলাও যেহেতু তার গোনাহে লিপ্ত হওয়ার একটা উপলক্ষ বা কারণ তাই তার ওই গোনাহগার সন্তানের সাথে সাথে মাতা-পিতাও গোনাহগাররূপে গণ্য হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন এক অনুকরণীয় পিতা, যিনি সন্তানদের প্রতি অগাধ ভালোবাসা, দয়া ও দায়িত্বশীলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর প্রতি গভীর স্নেহ প্রকাশ করে বলেছেন,

إِنِّي لَأُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا

(সহিহ বুখারি, ٣٧٦٧*)*

"আমি (হাসান ও হুসাইনকে) ভালোবাসি, তোমরাও তাদের ভালোবাসো।"

শুধু ভালোবাসাই নয়, তিনি সন্তানদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, যেমন তিনি বলেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ

(সহিহ মুসলিম, ٢٤٢١*)*

"হে আল্লাহ! আমি (হাসানকে) ভালোবাসি, আপনি তাঁকে ভালোবাসুন এবং যে তাঁকে ভালোবাসে তাকেও ভালোবাসুন।"

তিনি সন্তানদের কুরআন শিক্ষা, নবীর প্রতি ভালোবাসা ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলো দেওয়ার নির্দেশনা দিয়ে বলেন,

أَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ :حُبِّ نَبِيِّكُمْ، وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

(বায়হাকি, ٨٣٦٩, شُعَبُ الإِيمَانِ)

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের তিনটি বিষয়ে শিক্ষা দাও: তোমাদের নবীর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর পরিবারকে ভালোবাসা, এবং কুরআন তেলাওয়াত করা।"

নবীজির শিক্ষা অনুসারে উত্তম পিতা হওয়ার জন্য আমাদের উচিত সন্তানদের প্রতি দয়া ও ভালোবাসা দেখানো, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা, ইসলামি শিক্ষা ও নৈতিকতা শেখানো, কন্যাসন্তানদের বিশেষ যত্ন ও সম্মান প্রদান করা এবং ন্যায় ও ইনসাফের সঙ্গে তাদের লালন-পালন করা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই মহান আদর্শ অনুসরণ করলে আমরা সত্যিকারের দায়িত্বশীল পিতা হতে পারব এবং একটি সুন্দর, নৈতিকতাসম্পন্ন ও কল্যাণময় সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারব।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে দায়িত্বের ব্যাখ্যা

ইসলামে পিতা-মাতা সন্তানের জন্য প্রথম শিক্ষক এবং সবচেয়ে বড় অভিভাবক। সন্তান কেমন মানুষ হবে, তার ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় বিশ্বাস ও চারিত্রিক গুণাবলী পিতা-মাতার শিক্ষা ও লালন-পালনের উপর নির্ভর করে। তাই ইসলাম পিতা-মাতাকে কঠোরভাবে নির্দেশনা দিয়েছে যাতে তারা সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল হন।

কুরআন ও হাদিস থেকে উদাহরণ:

• আল্লাহ তাআলা বলেন:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।" (সূরা আত-তাহরিম: ৬)

➤ এই আয়াত স্পষ্টভাবে বলে যে, পিতা-মাতার দায়িত্ব শুধু সন্তানের শারীরিক যত্ন নেওয়া নয়, বরং তাদের ঈমান রক্ষা করা ও সঠিক পথে পরিচালিত করাও অপরিহার্য।

• রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (সহিহ বুখারি, ৮৯৩)

➤ এই হাদিসে বোঝানো হয়েছে যে, পিতা-মাতা শুধু নিজের জন্য নয়, বরং তাদের অধীনস্থ সন্তানদেরও সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য দায়বদ্ধ।

বিশেষত, তিনি কন্যাসন্তানের প্রতি যত্ন নেওয়াকে জান্নাত লাভের একটি উপায় হিসেবে বর্ণনা করেন, যেমন বলেন,

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّىٰ تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

"যে ব্যক্তি দুটি কন্যাসন্তানের লালন-পালন করে তাদের বড় করবে, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে একসঙ্গে থাকবো।"

কন্যা সন্তান প্রতিপালন করার ফযীলত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّىٰ تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

তোমাদের মধ্যে যারই তিনটি কন্যা অথবা তিনটি বোন আছে, সে তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী ২: ১৩)

এ হাদীসে ৩ জনের কথা এলেও অন্য হাদীসে ২ জন এবং এক হাদীসে ১ জনের কথাও এসেছে। যেমন বলা হয়েছে:

قُلْنَا وَثِنْتَيْنِ ؟ قَالَ وَثِنْتَيْنِ قُلْنَا وَ وَاحِدٌ ؟ قَالَ وَوَاحِدَةً -

অর্থাৎ আমরা সাহাবায়ে কেরাম নবীজীকে বললাম, হুযুর! যদি ৩ কন্যা না হয়ে ২ বা ১ কন্যা হয় আর পিতা তাদের উত্তমভাবে প্রতিপালন করে, তবে সেও কি উল্লেখিত ফযীলত পাবে? জবাবে নবীজী বলেন, হ্যাঁ, সেও পাবে।

(তবারানী)

তবারানী শরীফের আরেক হাদীসে এসেছে:

مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَأَدَّ بَهَا وَأَحْسَنَ أَدْبَهَا وَ عَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعَلِيمَهَا وَ

أَوْسَعَ عَلَيْهَا مَنْ نِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي أَوْسَعَ عَلَيْهِ -

যার একটা কন্যা সন্তান হবে, আর সে তাকে ইসলামী আদব-কায়দা শিক্ষা দিবে, উত্তমভাবে দ্বীনী জ্ঞান দান করবে এবং তার যাবতীয় প্রয়োজন সুন্দরভাবে মিটাবে তড়্থা উদারভাবে তার ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করবে।

مَنْ عَالَ حَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةُ كَهَا تَيْنِجَا أَشَارَ بِأَصْبَعَيْهِ -

যে ব্যাক্তি দু'টি কন্যা সন্তান প্রতিপালন করবে, আমি এবং সে একত্রে এভাবে পাশাপাশি জান্নাতে প্রবেশ করব। এই বলে তিনি নিজের হাতের দু'টি

আঙ্গুল একত্রে করে ইশারা করেন। (তিরমিযী শরীফ ২: ১৩)

مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ -

যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের নিয়ে এরূপ পরীক্ষার (বিপদের) সম্মুখীন হয়,

তারা তার জন্য জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।
(তিরমিযী শরীফ ২: ১৩)

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ إِخْوَاتٍ أَوَابْنَتَانِ أَوْ اخْتَانِ فَأَحْسَنَ

صُحْبَتَيْنِ وَ اتَّقَى اللّٰهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ -

যার তিনটি কন্যা অথবা তিনটি বোন আছে অথবা দু'টি কন্যা বা দু'টি বোন আছে, সে তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করলে এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে আল্লাকে ভয় করলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত। (তিরমিযী ২: ১৩)

যে ব্যক্তি তার কন্যা সন্তানদের কারণে কোনরূপ পরীক্ষার (বিপদের) সম্মুখীন হয়, সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করলে তারা তার জন্য জাহান্নাম

হতে আবরণ (বাধা) হবে। (তিরমিযী ২:১৩)

আরেক হাদীসে নবীজী ইরশাদ করেন:

যার তিনটি কন্যা হয় আর সে তাদেরকে দ্বীনী জ্ঞান, ইসলামী শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, সুন্দরভাবে তাদের প্রতিপালন করে এবং তাদের প্রতি মমতাসুলভ আচরণ করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (আদাবুল মুফরাদ লিল ইমাম বুখারী)

পুত্র সন্তানের প্রতি মানুষের স্বভাবজাত ভালবাসা ও আন্তরিকতা থাকায় তাদের ফযীলত সম্পর্কে শরীয়ত বিশেষ গুরুত্বারোপ করে নি। কিন্তু কন্যা সন্তানকে মানুষ যেহেতু গুরুত্ব দেয় না, তুচ্ছ ভাবে, তাই শরীয়ত তাদের প্রতিপালনের ফযীলত বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছে। (ফুরূউল ঈমান-৭৬)

সন্তান লালন-পালন একটি আমানত

(১) আমানত কী?

আমানত শব্দের অর্থ হলো—বিশ্বাস, নিরাপত্তা ও দায়িত্ব। ইসলামের দৃষ্টিতে, সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে বাবা-মায়ের কাছে একটি পবিত্র আমানত। এ মানে এই নয় যে সন্তান শুধু ভালোবাসা ও যত্ন পাওয়ার অধিকারী, বরং এর অর্থ হলো, পিতা-মাতার ওপর দায়িত্ব রয়েছে এই আমানতের যত্ন নেওয়ার, তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার, দ্বীনি ও দুনিয়াবি শিক্ষায় গড়ে তোলার। সন্তানের চরিত্র, নৈতিকতা ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করাই এই আমানতের প্রকৃত হক আদায় করা। তাই বাবা-মায়ের উচিত এ দায়িত্বকে হালকাভাবে না নিয়ে, সচেতনভাবে পালন করা, যেন তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে এই আমানতের হিসাব দিতে পারে সফলতার সঙ্গে।

(২) সন্তান লালন-পালন কেন আমানত?

• সন্তান নিজের সম্পদ নয়; বরং এটি আল্লাহর দান।
• আল্লাহ পিতা-মাতার উপর দায়িত্ব দিয়েছেন যেন তারা সন্তানকে সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও ঈমানদার হিসেবে গড়ে তোলেন।
• যদি পিতা-মাতা এই দায়িত্ব অবহেলা করেন, তবে তারা কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে।

কুরআন ও হাদিস থেকে দৃষ্টান্ত:

• রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"সন্তান যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন সে ফিতরাতের (শুদ্ধ প্রকৃতির) উপর জন্ম নেয়। পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে।" (সহিহ মুসলিম, ২৬৫৮)

➤ এর অর্থ, প্রতিটি শিশু নির্দোষ ও বিশুদ্ধভাবে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু পিতা-মাতার শিক্ষা ও পরিবেশই তাকে সঠিক বা ভুল পথে পরিচালিত করে।

• ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বলেন:
"সন্তান হলো একটি সুন্দর, অমলিন ও পবিত্র আমানত। তার হৃদয় একটি উন্মুক্ত ভূমির মতো, যেখানে যা বপন করা হবে তাই বৃদ্ধি পাবে।"

➤ এটি বোঝায় যে, যদি পিতা-মাতা ভালো শিক্ষা ও মূল্যবোধ দেন, তাহলে সন্তান সঠিক পথে চলবে। আর যদি তারা উদাসীন হন, তাহলে সন্তান পথভ্রষ্ট হতে পারে।

সন্তানের প্রতি মহব্বত সৃষ্টির কারণ

বাচ্চারা ঘনঘন পেশাব-পায়খানা করে শরীর, কাপড় ইত্যাদি নোংরা করা সত্ত্বেও তাদের আদর-যত্নে সুষ্ঠু প্রতিপালন করাটা আন্তরিক মহব্বত ও পরম মমতা ছাড়া সম্ভব হতে পারে না। বাচ্চারা সর্বক্ষণ পিতামাতা হতে সেবা গ্রহণ করে, নিজেরা একটি সেবাও দিতে পারে না। তাদের চাল-চলনও অনেকটা পাগলের মত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এমন মহব্বত সৃষ্টি করেছেন যে, তাদের ছেলেমি আচরণগুলোতে বড্ড ভাল লাগে। অনেক সময় তারা দুষ্টুমি করে। যার ফলে শাস্তি দেয়া জরুরী হয়ে যায়। কিন্তু বাচ্চাদের ব্যাপারে জ্ঞানীজনেরা বিপাকে পড়েন। কেউ বলেন, শাস্তি দিতে হবে। আবার কেউ বলেন, না শাস্তি দেয়া যাবে না। তাদের থেকে ভুল-ভ্রান্তি সাধারণত একটু হয়েই থাকে। এসব ক্ষমার নজরে দেখা উচিত। নলী

মোটকথা, নিজের বাচ্চা তো অবশ্যই এমনটি অপরের বাচ্চাদের দেখলেও অন্তরে মহব্বত জেগে ওঠে। তাদের সবধরনের আচরণ ভাল লাগে। এ ধরনের মহব্বত ও মমতা না থাকলে তাদের জন্য রাত জাগা এবং পেশাব-পায়খানা করানো কঠিন হয়ে যেত। অপরের বাচ্চার খেদমত করতে গেলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহর ভয়ে প্রতিদিন তার খেদমত করে গেলেও অন্তরে এক ধরনের অনীহাবোধ সৃষ্টি হবে। রাগও হবে। অপরের সন্তানের প্রতিপালনে অনীহা লাগে এই জন্যই যে, অন্তরে তার প্রতি প্রকৃত ও যথার্থ মহব্বত থাকে না। যেহেতু সন্তান প্রতিপালনের মত কষ্টকর ও দুরূহ কাজ মহব্বত ছাড়া অসম্ভব, তাই আল্লাহ তা'আলা সন্তানের মহব্বত পিতামাতার অন্তরে এমনভাবে গেঁথে দিয়েছেন যে, তারা সন্তানের খেদমত না করে থাকতে পারে না। মহব্বতই তাদেরকে সন্তানের যে কোন প্রয়োজন পূরণে স্বভাবগতভাবেই প্রেরণা জুড়িয়ে থাকে 1

সন্তান লাভের আকাংখা

মানুষ সাধারণত সন্তান চায় এই কারণে যে, যেন দুনিয়াতে তার নাম- কাম বাকী থাকে এবং বংশধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন তথ্য দেয়। কোন সমাবেশে গিয়ে যদি আপনি মানুষদের কাছে পূর্বসূরীদের নাম জানতে চান, তাহলে অনেকেই পরদাদার নামটি পর্যন্ত বলতে পারবে না। যখন নিজের বংশের লোকেরাই পরদাদার নাম জানে না, সেখানে অন্য লোকদের কথা কীভাবে জানবে? তাহলে বলুন, সন্তানের মাধ্যমে মানুষ যে 'অমরত্ব'-এর নিয়াত করে সেটা কীভাবে সম্ভব?

প্রিয় সূধীবৃন্দ! পৃথিবীতে মানুষের নাম-যশ বাকী থাকে আল্লাহর অনুগত হওয়ার মাধ্যমে। আপনারা আল্লাহর অনুগত হয়ে যান, দেখবেন অমর হয়ে গেছেন। সন্তান-সন্ততির দ্বারা কখনো অমর হয় না; বরং সন্তান অযোগ্য- অপদার্থ হলে উল্টো ধিকৃত ও হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। সন্তানের কারণে কেউ যদি সুনামের পাত্র হয়েও যায়, তবে এটা এমন কী অর্জন যে, তার জন্য আকাঙ্খী হতে হবে।

স্বভাবগতভাবে কেউ সন্তানের আকাঙ্খী হলে আমি তাকে মন্দ বলছি না। কেননা সন্তানের মহব্বত মানুষের স্বভাবজাত। এ কারণে অনেকে জান্নাতে গিয়েও আকাঙ্খা করবে। অথচ সেখানে নাম-যশ কারো লক্ষ্য হবে না। কেননা জান্নাতীদের মৃত্যুই হবে না। কেউ সন্তান চাইলে তা একমাত্র স্বভাবজাত চাহিদার কারণেই হবে। এ জন্য আমি সন্তানের আকাঙ্খা হতে বারণ করি না।

আমার উদ্দেশ্য শুধু এটা বলা যে, সন্তানের স্বভাবজাত এই চাহিদার কারণে স্ত্রীকে এই বলে কষ্ট দেয়া এবং শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করা যে, “তোর সন্তান হয় না কেন?" অথবা "তোর শুধু মেয়ে হয় কেন?” যেহেতু সন্তান হওয়া-না হওয়ার মালিক স্ত্রী নয় এবং ছেলে-মেয়ে নির্ধারণের ক্ষমতাও তার হাতে নয়- এমতাবস্থায় স্ত্রীদের এ ধরনের অনিচ্ছাকৃত দোষ বের করে তাদের প্রতি রাগান্বিত হওয়া, কোনরূপ নির্যাতন-বাড়াবাড়ি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম। যারা এমন করে তাদের মনে রাখতে হবে, সন্তান দেন আল্লাহ, সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে তাও নির্ধারণ করেন আল্লাহ; এখানে যেমন স্বামীর কোন হাত নেই, তেমনি স্ত্রীরও দখল নেই। তাহলে সন্তান না হলে কিংবা শুধু মেয়ে হলে বেচারী স্ত্রীর কী দোষ?

অনেক সময় রাজা-বাদশাদের সন্তান হয় না। অথচ তারা সবধরনের শক্তিশালী খাদ্য-খাবার খান, গর্ভ সঞ্চারের জন্য ঔষধও ব্যবহার করেন, কিন্তু তারপরও সন্তান হয় না। সন্তান হওয়া, না হওয়ার সমুদয় কর্তৃত্ব আল্লাহর। এখানে মহিলাদের বিন্দুমাত্র দখল নেই। আমি অনেক পুরুষকে দেখেছি, যারা স্ত্রীদের এই বলে ধমকায় যে, "হতভাগী! তোর শুধু মেয়ে আর মেয়েই হয়।" আমার কথা হল, এতে বেচারীদের দোষ কোথায়? ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে, হতে পারে, এতে আপনার ত্রুটিই ধরা পড়বে। দ্বিতীয় কথা হল, বেশি মেয়ে হওয়া তো কোন অপ্রিয় ব্যাপার নয়।

(হুকুকুয যাওজাইন)

সন্তান আখিরাতের পাথেয় হওয়া বিরাট নিয়ামত

সন্তান দ্বীনী ব্যাপারে পিতামাতার সাহায্য করলে সেটা আল্লাহর একটি বিরাট নিয়ামত। একটি ঘটনা শুনুন:

একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বিবাহ করছিলেন না। একদিন তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে বলেন, আমার জন্য মেয়ে খোঁজো, আমি বিবাহ করব। সেখানে তার এক মুরিদ ছিল। সে তার বিবাহ যোগ্য মেয়ের কথা বললে বুযুর্গ রাযি হয়ে যান। তখনি তাদের বিবাহ হয়। বুযুর্গ স্ত্রী নিয়ে সুখেই ছিলেন। একসময় বুযুর্গের স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে একটি সন্তান জন্ম দেয়। জন্মের কিছুদিন পর সন্তানটি মারা যায়। বুযুর্গ তখন স্ত্রীকে বলেন, বিয়ে করার লক্ষ্য আমার অর্জিত হয়ে গেছে। এখন তোমার ইচ্ছা, তুমি চাইলে তোমাকে মুক্ত করে দিব। তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করে নিবে। আর আল্লাহর স্মরণে বাকী জীবন কাটাতে চাইলে এখানেই থেকে যেতে পার। যেহেতু স্ত্রী বুযুর্গের সান্নিধ্যে কিছুদিন কাটিয়েছিল এবং সান্নিধ্যের বরকতও তার মধ্যে এসে গিয়েছিল, তাই স্ত্রী বলে, আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। অতঃপর স্বামী স্ত্রী নিজেদেরকে আল্লাহর স্মরণে ওয়াক্‌ফ করে দেয়।

বুযুর্গের ঘনিষ্ঠজনেরা একবার বুযুর্গের কাছে জানতে চায় যে, হযরত! ব্যাপারটি খুলে বলুন তো। আগে আপনি বিবাহ করতে অনিচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ কেন বিয়ের আগ্রহ দেখাচ্ছেন? তখন তিনি বলেন, ঘটনা হল, আমি একদিন ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে দেখি, হাশরের ময়দান

সামনে। পুলসিরাত দিয়ে মানুষ অতিক্রম করছে। এক লোককে দেখলাম, সে পুলসিরাত পার হতে পারছিল না। পার হতে গিয়ে বারবার পড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি বাচ্চা এসে তার হাত ধরে দ্রুত তাকে পার করিয়ে দিল। আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, বাচ্চাটি কে? আমাকে জানানো হল, বাচ্চাটি ঐ লোকেরই সন্তান। শৈশবেই সে মারা গিয়েছিল। আজ সে বাচ্চাই তার জন্য সাহায্যকারী হয়েছে।

এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি চিন্তা করলাম, এই ফযীলত থেকে আমার দূরে থাকা ঠিক নয়। হতে পারে, আমার সন্তান আমার নাজাতের ওসিলা হবে। এই ভেবে আমি বিবাহ করে ফেলি এবং আমার লক্ষ্যও অর্জিত হয়ে গেছে।
(দুনিয়া ও আখিরাত- ৯৮)

সন্তানের গুরুত্ব ও তার ফযীলত

- عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّي مُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ

হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা বিবাহ কর অতি সোহাগিনী ও অধিক সন্তান প্রসবিনী নারীকে। কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করব।

(আবু দাউদ, মেশকাত- ২৬৭)

সন্তানের ফায়দা অনেক। কিছু ফায়দা (লাভ) দুনিয়াতেই মেলে আর কিছু মিলবে আখিরাতে।

১.সন্তান হওয়ার দুনিয়াবী ফায়দা হল-

(১) দুনিয়াতে পিতামাতার সবচেয়ে বেশি খেদমত করে নিজ সন্তান।

(২) সর্বাবস্থায় সাহায্য করে সন্তান।

(৩) সর্বাধিক অনুগত থাকে সন্তান।

(৪) আন্তরিকতার সাথে কল্যাণকামী হয় সন্তান।

২.সন্তান হওয়ার পরকালীন ফায়দা

(১) পিতামাতা মারা গেলে সন্তান তাদের জন্য দু'আ করে।

(২) সন্তানের মাধ্যমে বংশধর বৃদ্ধি পেলে তাদের মধ্যে যারা দ্বীনের উপর চলে তাদের থেকেও পূর্বসুরীরা সওয়াব পেয়ে থাকে।

(৩) সন্তান শৈশবে মারা গেলে তারা পিতামাতার জান্নাতে যাবার বড় ওসিলা হয়ে যায়।

(৪) সন্তান বড় হয়ে নেককার হলে, তারাও কিয়ামতের দিন পিতামাতার জন্য সুপারিশ করবে।

সন্তান হওয়ার আরো কয়েকটি বড় লাভ হল-

(১) এতে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যার মাধ্যমে দুনিয়াতে ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তিও বেড়ে যায়।

(২) সন্তান যত বেশি হবে, কিয়ামতের দিন নবীজী তত খুশি হয়ে গর্ব করবেন। (হায়াতুল মুসলিমীন রূহ ২০: ১৮৯)

৩.সন্তানের জন্য সর্বক্ষণ কষ্ট ও দুশ্চিন্তা

মহিলাদের সন্তান হওয়া কঠিন বিপদ। মানুষ বলে, সন্তান প্রসবের পর মহিলারা যেন দ্বিতীয়বার জিন্দা হয়। সন্তান পুরুষের জন্যও কম মুসিবতের নয়। বাচ্চা প্রসব হতেই শুরু হয় তার খরচের পালা। সূতীকাগারের প্রয়োজনীয় জিনিস হতে পদে পদে সব কিছু সরবরাহ করা লাগে তার। নবজাতক তো ফুল ও পানের মত অত্যন্ত দুর্বল থাকে। সামান্যতেই ম্রিয়মান ও মলিন হয়ে যায়। একটু ঠান্ডা বাতাস লাগলেই নিস্তেজ হয়ে যায়। একটু বেশি গরম লাগলে ভীষণ বিচলিত হয়। কাঁদতে শুরু করলে অবিরত কাঁদতেই থাকে। অনেক সময় কাঁদার কারণ বুঝা যায় না। বাচ্চারা অবলা হয়।

নিজেদের সমস্যার কথা বলতে পারে না। তাদের চিকিৎসাও করতে হয় অনুমানের উপর নির্ভর করে। কখনো মনে হয় যে, হয়ত পেটে ব্যথায় কাঁদছে। তখন পেট মর্দন কিংবা পেটে ব্যাথার তাবীজ দেয় হয়। কখনো ধারণা করা হয় যে, হয়ত কানে ব্যাথা। তখন কানে তামাকের পিক দেয়া হয়। এসব কাজকে তেমন কষ্টকর মনে করা হয় না। বাচ্চাদের এসবে খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধান মহিলারা নিজেরাই করে ফেলে।

আবার কখনো বাচ্চাদের এমন রোগ হয়, যা পরিবারের লোকজন নির্ণয় করতে পারে না। তখন অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের স্মরণাপন্ন হতে হয়। এক বিঘত সন্তানের জন্য অল্প সময়েই হাজার হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। তখন মানুষের মাথা ঘুরে যায়। নিজের অজান্তে মুখ হতে বের হয়ে, “সন্তান আমাকে শেষ করে দিল।" আমি বলি, সন্তানের কী দোষ? আপনিই তো তাকে ডেকে এনেছেন।
সন্তান একটু সুস্থ হলে পিতামাতার ধড়ে প্রাণ ফিরে আসে। সন্তানের শরীর একটু খারাপ হলেই পিতামাতার জীবন বিস্বাদ হয়ে যায় সন্তানের মুখে হাসি ফোটার আগে তাদের মুখে হাসি ফোটে না।

এরপর সন্তান যখন বড় হয়, তখন তার বিবাহ-শাদীর প্রয়োজন দেখা দেয়। বিবাহের পরে সন্তানের ঘরে তার সন্তান আসে। তখন নিজের সন্তানের মত আবার ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। নানান চিন্তা ও ব্যস্ততা তাকে ঘিরে ধরে। আল্লাহ আল্লাহ করে যে সমস্ত কষ্ট-চিন্তা থেকে পরিত্রাণ লাভ হয়েছিল, আবার তার সূচনা হয়। ও দিকে সন্তানের যদি সন্তান না হত, তাহলে সেটাও ছিল আরেক পেরেশানী। চিন্তা হত, কেন নাতি হয় না? হলেও সুখ নেই। সন্তান হওয়া মানেই হাজারো ঝামেলা ও চিন্তার দুয়ার খোলা।

মোটকথা, সন্তান এক বিরাট ঝামেলার বিষয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল, কেউ এর থেকে মুক্ত না। এমনকি এই ঝামেলা মানুষের এত সওয়া (সহ্যকর) হয়ে গিয়েছে যে, সন্তান না থাকলেই বরং সে বিচলিত হয়ে ওঠে। ঘরে সন্তান না থাকলে ঘর ফাঁকা লাগে। নিঃসঙ্গ মনে হয়। দিন-রাত একান্ত উদাসীন ও অলসভাবে কাটে। (আত তাবলীগ-২৪)

ইসলামে পরিবার গঠনের উদ্দেশ্য

১. পরিবার কেন গুরুত্বপূর্ণ?

পরিবার কেন গুরুত্বপূর্ণ—এই প্রশ্নের উত্তরে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গভীর ও অর্থবহ। ইসলাম পরিবারকে শুধু সামাজিক একটি কাঠামো হিসেবে নয়, বরং একটি পবিত্র ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেছে। কারণ পরিবারই হলো মানব সমাজের মূল ভিত্তি। ব্যক্তি যে আদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নিয়ে বড় হয়, তার ভিত্তি গড়ে ওঠে পরিবারেই। একটি সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ ও দায়িত্বশীল পরিবার গড়ে উঠলে সেই পরিবার থেকে বেরিয়ে আসে সৎ নাগরিক, আদর্শ মুসলমান, এবং ভালো মানুষ। আর এইরকম পরিবারসমূহই মিলে গড়ে তোলে একটি সুস্থ ও শক্তিশালী সমাজ। তাই পরিবার গঠনে যত্নবান হওয়া, পরস্পরের হক আদায় করা এবং ইসলামী আদর্শে সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(২) ইসলামি পরিবার গঠনের উদ্দেশ্য:

১. সন্তানদের সঠিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠন:

• পরিবারই হলো সন্তানদের প্রথম শিক্ষা কেন্দ্র, যেখানে তারা নৈতিকতা, ঈমান, ও সামাজিক মূল্যবোধ শেখে।

• রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারকে সবচেয়ে ভালো ব্যবহার করে।" (তিরমিজি : ৩৮৯৫)

২. নৈতিকতা ও আদর্শ রক্ষা করা:

একজন অভিভাবকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো সন্তানের নৈতিকতা ও আদর্শ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। একটি শিশু যেভাবে শিখে, বেড়ে ওঠে এবং চারপাশ থেকে যা দেখে তা-ই তার চিন্তা, বিশ্বাস ও চরিত্র গঠনে প্রভাব ফেলে। তাই বাবা-মায়ের উচিত ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে সত্যবাদিতা, ধৈর্য, সম্মান, সহমর্মিতা ও আল্লাহভীতি শেখানো। সন্তান যেন শুধু ভালো ফলাফল না করে, বরং একজন ভালো মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠে—এটাই হওয়া উচিত মূল লক্ষ্য। শিশুর সামনে নিজেদের আচরণের মাধ্যমে সদাচরণ, নম্রতা ও ন্যায়ের আদর্শ তুলে ধরলে তা তার মনে গভীর প্রভাব ফেলে। কারণ সন্তান শুধু উপদেশে নয়, সবচেয়ে বেশি শেখে অভিভাবকের কাজকর্ম দেখে। তাই যদি আমরা চাই আমাদের সন্তান সৎ, আদর্শবান ও দ্বীনদার হোক, তাহলে আমাদের নিজেদের জীবনে সেই নৈতিকতা ও আদর্শ অনুসরণ করাই সর্বপ্রথম করণীয়।

৩. ইসলামি জীবনধারার বিস্তার:

• ইসলাম চায়, প্রতিটি পরিবার যেন আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করে।

• কুরআন বলে:

"নিশ্চয়ই সফল হয়েছে সে ব্যক্তি যে তার পরিবারকে পবিত্র রেখেছে।" (সূরা আশ-শামস: ৯)

• তাই একটি পরিবার যদি ইসলামি আদর্শ মেনে চলে, তবে তা পুরো সমাজের জন্য কল্যাণকর হয়।

(৩) সন্তান লালন-পালনের প্রভাব সমাজ ও জাতির উপর

একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার নতুন প্রজন্মের ওপর। ইসলাম সুস্থ, যোগ্য ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন প্রজন্ম গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

১. সুসন্তান সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনে

সুসন্তান সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনে—এ কথা যেমন বাস্তব, তেমনি ইসলামের দৃষ্টিতেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি প্রত্যেক পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালন করেন, নৈতিকতা, আদব-কায়দা, ধর্মীয় জ্ঞান ও দায়িত্ববোধে শিক্ষিত করে তোলেন, তবে সেই সন্তান বড় হয়ে হবে একজন সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও সমাজসচেতন মানুষ। এ ধরনের মানুষের সংখ্যা যত বাড়বে, সমাজ ততটাই নিরাপদ ও স্থিতিশীল হবে। কারণ, একটি সমাজে শান্তি তখনই স্থায়ী হয়, যখন তার নাগরিকরা ন্যায়ের পথে চলে এবং অন্যের হক আদায়

করে। আর এর ভিত্তি গড়ে ওঠে পরিবারে, বাবা-মার সঠিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে। কাজেই সুসন্তান গড়ে তোলার চেষ্টাই ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের প্রথম ধাপ।

২. জ্ঞান ও নেতৃত্বের বিকাশ

জ্ঞান ও নেতৃত্বের বিকাশ

একজন সুসন্তান শুধু নিজের পরিবারকেই আলোকিত করে না, বরং সমাজ ও জাতির ভবিষ্যৎ গড়তেও বড় ভূমিকা রাখে। যখন কোনো সন্তানকে ভালো শিক্ষা, নৈতিকতা এবং সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে গড়ে তোলা হয়, তখন সে বড় হয়ে হয় একজন আত্মবিশ্বাসী, চিন্তাশীল ও দায়িত্বশীল মানুষ। সে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে—যেমন ন্যায়পরায়ণ নেতা, জ্ঞানী আলেম, দক্ষ চিকিৎসক, উদ্ভাবনী বিজ্ঞানী বা আদর্শ শিক্ষক—হয়ে নেতৃত্ব দিতে পারে। এ ধরনের মানুষেরাই জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, এবং আলোকিত ভবিষ্যতের ভিত্তি তৈরি করে। তাই সন্তানদের জ্ঞানের আলোয় গড়ে তোলা শুধু ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়, এটি একটি জাতিগঠনের কাজও বটে।

৩. সমাজে ন্যায়বিচার ও সততার প্রসার

যেসব সন্তান ছোটবেলা থেকেই নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, তারা জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে শেখে। তারা জানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং দুর্নীতির পথ এড়িয়ে চলা কেন গুরুত্বপূর্ণ। এরা দায়িত্বশীল, বিশ্বাসযোগ্য ও বিবেকবান নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে, যারা সমাজে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। যখন সমাজে এমন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ বাড়তে থাকে, তখন ধীরে ধীরে অন্যায়, দুর্নীতি ও অবিচারের জায়গা সংকুচিত হয়ে আসে। এর ফলেই সমাজে স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা গড়ে ওঠে, যা সকলের জন্য কল্যাণকর।

৪. ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপদ ভিত্তি তৈরি

সুন্দরভাবে গড়ে ওঠা সন্তানরা একসময় নিজেরাও পিতা-মাতা হবে এবং তাদের সন্তানদের প্রতিও একই নৈতিক দায়িত্ব পালন করবে। এভাবে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আদর্শ এবং ইসলামি শিক্ষা প্রবাহিত হতে থাকে। যদি আজ আমরা সন্তানদের সঠিকভাবে গড়ে তুলি, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের নাতি-নাতনিরাও একটি সৎ ও সুস্থ সমাজে বড় হবে ইন শা আল্লাহ। এই ধারাবাহিকতাই একটি জাতির স্থায়ী উন্নতি ও নৈতিক ভিত্তির মূল চাবিকাঠি।

অবহেলার কারণে সামাজিক ও ধর্মীয় অবক্ষয়

যদি সন্তানদের যথাযথ ইসলামি শিক্ষা ও নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া না হয়, তাহলে তা সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

১. পারিবারিক মূল্যবোধ নষ্ট হওয়া

সন্তানরা যদি শৈশব থেকেই ভালো শিক্ষা না পায়, তাহলে তারা পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্য হয় এবং পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে।

আল্লাহ বলেন:

"পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করো। যদি তোমার কাছে তাদের একজন বা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের 'উফ' বলো না এবং তাদের ধমক দিও না..." *(সূরা আল-ইসরা: ২৩)*

২. অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া

সন্তানদের সঠিক দিকনির্দেশনা না দিলে তারা মাদকাসক্তি, চুরি, প্রতারণা, দুর্নীতির মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়তে পারে।

৩. ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব

যেসব সন্তানদের ছোটবেলা থেকে নামাজ, রোজার মতো ধর্মীয় বিধান শেখানো হয় না, তারা বড় হয়ে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে অনীহা প্রকাশ করে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে।

৪. সামাজিক বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি

সন্তান যদি ভুল পথে পরিচালিত হয়, তবে তারা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ভুল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, ফলে সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধের হার বেড়ে যেতে পারে।

সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন শুধু পারিবারিক নয়, বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্য। সঠিকভাবে সন্তানদের লালন-পালন করা হলে তারা সমাজ ও জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। পক্ষান্তরে, যদি অভিভাবকরা দায়িত্বে অবহেলা করেন, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিপথগামী হয়ে পড়বে এবং সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। তাই, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের ভালোভাবে গড়ে তোলা, যেন তারা সৎ, ধর্মভীরু ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারে।

জ্ঞান ও শিক্ষা

ইসলামি জ্ঞানার্জন কতোটা জরুরি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জ্ঞানার্জন বাধ্যতামূলক।(সুনানু ইবনি মাজাহ: ২২৪)

জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি জারি থাকে আমাদের এই দায়বদ্ধতা।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, 'যে জ্ঞানের পথ ধরে, আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।' (সহীহ বুখারী: ৬৭; সহীহ মুসলিম: ২৬৯৯)

আমরা যে পড়াশোনা করতে পারি, কোনোকিছু উপলব্ধি করতে পারি-এটা আমাদের বাকি সব সৃষ্টি থেকে আলাদা করে। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছেশক্তির সাথে এর সম্বন্ধ আছে। জ্ঞানার্জনের সামর্থ্য না থাকলে স্বাধীন ইচ্ছেশক্তি অরাজকতায় পরিণত হয়।

জ্ঞান আমাদের সত্য-সুন্দরের পথ দেখায়। এটা ছাড়া সফল হবার পথ নেই। আল্লাহ কুরআনে জ্ঞানী মানুষের অনেক প্রশংসা করেছেন-

>আল্লাহর বান্দাদের মাঝে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে। (সূরা ফাতির, আয়াত: ২৮)

> মানুষের মাঝে যেসব উদাহরণ আমি দিই, জ্ঞানীরা ছাড়া তা কেউ বুঝবে না।(সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৪৩)

>আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না-তারা কি সমান? সমঝদার লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা যুমার, আয়াত : ৯)

জ্ঞান তালাশে মগ্ন হৃদয়কে উৎসাহ জোগাবে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ-কথাগুলো-

>আল্লাহ যার ভালো চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। (সহীহ বুখারী: ৭০; সহীহ মুসলিম: ১০৩৭)

কেউ জ্ঞানার্জনের পথে পা বাড়ালে, আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। তার কাজের মূল্যায়ন করে ফেরেশতারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেয়। মহাকাশ- পৃথিবীর সব প্রাণী-এমনকি

জলের মাছও জ্ঞান অর্জনকারীর জন্য ক্ষমা চায়। তারাদের মাঝে পূর্ণিমার চাঁদ যেমন, ইবাদতগুজারদের মাঝে একজন আলিম তেমন। জ্ঞানীরা নবীদের উত্তরাধিকারী। সম্পত্তি হিসেবে নবীরা টাকাপয়সা রেখে যাননি; রেখে গেছেন জ্ঞান। যে জ্ঞান অর্জন করবে, সে এর সম্পূর্ণ ভাগ পাবে।
(সুনানু আবি দাউদ: ৩৬৪১; জামি তিরমিযী: ২৬৮২)

> অন্য একবার বলেছেন, 'কেবল দুটো ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ঈর্ষা করা যায়: এক. আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন, আর সে এগুলো ন্যায় কাজে ব্যয় করে। দুই. আল্লাহ যাকে প্রজ্ঞা দিয়েছেন এবং সে সেই অনুযায়ী কাজ করে অন্যদের শেখায়।' (সহীহ বুখারী: ১৪০৯; সহীহ মুসলিম: ৮১৬)

কুরআন-হাদীস থেকে দেখতে পাচ্ছি জ্ঞানার্জনের কী বিশাল গুরুত্ব, কতো উৎসাহ। শুধু নিজের জন্য নয়; অন্যকে শেখানোর তাগিদও এখানে দেওয়া হয়েছে

ইসলামে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ও জ্ঞানীদের মর্যাদা: কোরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ

ইসলামে জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কোরআন ও হাদিসে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব এবং জ্ঞানীদের উচ্চ মর্যাদার কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে।

১. কোরআনের আলোকে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব

কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:
১."পড়ো, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"
(সূরা আলাক: ১)

- এটি ইসলামে নাজিল হওয়া প্রথম আয়াত, যেখানে স্পষ্টভাবে ‘পড়ার’ আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা শিক্ষার গুরুত্ব বোঝায়।

২ ."**যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?"**
(সূরা যুমার: ৯)

- আল্লাহ এখানে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, জ্ঞানী ও অজ্ঞের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জ্ঞানীদের মর্যাদা অনেক বেশি।

৩ "আল্লাহ ঈমানদারদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং জ্ঞানীদের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করেন।"
(সূরা মুজাদালাহ: ১১)

- যারা জ্ঞান অর্জন করে, আল্লাহ তাদের সম্মানিত করেন এবং তাদের উচ্চস্থানে উন্নীত করেন।

২. হাদিসের আলোকে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ (সা.) জ্ঞানার্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বহু হাদিসে এর ফজিলত সম্পর্কে বলেছেন।

1. **"জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক।"**
   (ইবনে মাজাহ: ২২৪)
   - এটি প্রমাণ করে যে, জ্ঞান শুধুমাত্র আলেমদের জন্য নয়, বরং প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য আবশ্যক।

২." যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"
(মুসলিম: ২৬৯৯)

- এখানে বোঝানো হয়েছে, যারা জ্ঞান অর্জনে সময় ও শ্রম ব্যয় করে, তারা আখিরাতে পুরস্কৃত হবে।

৩ "জ্ঞানীদের উত্তরাধিকার নবীদের উত্তরাধিকার। নবীরা ধন-সম্পদ রেখে যান না, বরং তারা জ্ঞান রেখে যান। যে তা গ্রহণ করে, সে বিরাট অংশ লাভ করে।"
(তিরমিজি: ২৬৮২)

- নবীদের রেখে যাওয়া আসল সম্পদ হলো জ্ঞান, যা অর্জন করলে মানুষ সত্যিকারের সফলতা লাভ করে।

৩. ইসলামে জ্ঞানীদের মর্যাদা

ইসলামে জ্ঞানীরা বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত। কারণ, তারা সত্য ও সঠিক পথের দিশারী।

1. **১ .জ্ঞানীরা নবীদের উত্তরসূরি** – তারা মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখায় এবং ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়।
2. **ফকিহ ও আলেমদের মর্যাদা** – নবী (সা.) বলেছেন, **"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।"** *(বুখারি: ৭১)*

৩ জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও মূল্যবান – ইসলামী পরিভাষায় বলা হয়, "আলেমদের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও মর্যাদাসম্পন্ন।" কারণ, জ্ঞান সমাজ ও মানবতার উন্নতি সাধন করে।

জ্ঞান বলতে কোন জ্ঞান

ইসলামে জ্ঞানকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়:

১. ব্যক্তিগত জ্ঞান (Individual Knowledge)

এটি সেই জ্ঞান যা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অর্জন করা ফরজ বা অত্যাবশ্যকীয়। ইসলামে ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব অত্যধিক, কারণ এটি প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। ব্যক্তিগতভাবে অর্জিত জ্ঞান মূলত তিন ভাগে বিভক্ত:

(ক) আকিদার জ্ঞান: আল্লাহর একত্ব, নবুয়ত, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক।
ইবাদতের জ্ঞান: নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদির সঠিক নিয়ম-কানুন জানা প্রয়োজন।
নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা: কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত আদর্শ জীবনযাপন ও উত্তম চরিত্র অর্জনের জন্য জ্ঞান আহরণ করা।

২. সমষ্টিগতভাবে জ্ঞান (ফরজ কিফায়াহ) অর্জন করা

এটি এমন জ্ঞান, যা কিছু সংখ্যক মানুষ অর্জন করলেই সমাজ উপকৃত হয়। যেমন:

(ক) ধর্মীয় জ্ঞান: কোরআন, হাদিস, ফিকহ, আকিদা ও তাফসির ইত্যাদির উপর গবেষণা করা এবং অন্যদের শিখানো।
(খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি: মেডিসিন, প্রকৌশল, তথ্যপ্রযুক্তি, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় শেখা। এগুলো মানবকল্যাণে বড় ভূমিকা রাখে।

(গ) সামাজিক ও মানবিক বিদ্যা: নৈতিকতা, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার মাধ্য

জ্ঞান অর্জনের উপায় ও করণীয়

(১) ইখলাস (বিশুদ্ধ নিয়ত) থাকা:

জ্ঞান শুধু দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অর্জন করতে হবে।

(২) ধারাবাহিক অধ্যবসায়:

নবী (সা.) বলেছেন, **"সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো নিয়মিত করা, যদিও তা কম হয়।"** *(বুখারি: ৬৪৬৪)*

(৩) আমলে পরিণত করা:

শুধু মুখস্থ করাই যথেষ্ট নয়, বরং অর্জিত জ্ঞান অনুসারে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

(৪) অন্যকে শিক্ষা দেওয়া:

নবী (সা.) বলেছেন, **"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে নিজে কোরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।"** *(বুখারি: ৫০২৭)*

ইসলামে জ্ঞানের উৎস

(১) আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান

মূলত সমস্ত জ্ঞানের চূড়ান্ত উৎস হলেন **আল্লাহ তাআলা**। তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং চূড়ান্ত জ্ঞানী।

কোরআনে আল্লাহ বলেন:

"আর তোমাদের দেওয়া হয়নি জ্ঞানের অল্প অংশ ছাড়া।"

(সূরা আল-ইসরা: ৮৫)

- মানুষের জ্ঞান সীমিত, আর আল্লাহর জ্ঞান অসীম।

"আর তিনি (আল্লাহ) আদমকে সমস্ত বস্তুর নাম শিখিয়ে দিলেন..."

(সূরা আল-বাকারা: ৩১)

- এখান থেকে বোঝা যায়, প্রথম মানুষ আদম (আ.)-এর শিক্ষাদাতা স্বয়ং আল্লাহ।

(২) কোরআন ও হাদিস (ওহীভিত্তিক জ্ঞান)

কোরআন হল মানবজাতির জন্য আল্লাহর দেওয়া চূড়ান্ত জ্ঞানভাণ্ডার।

"এই কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই; এটা মুত্তাকিদের জন্য পথনির্দেশ।"

(সূরা আল-বাকারা: ২)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসও ইসলামের অন্যতম জ্ঞানের উৎস।

নবী (সা.) বলেছেন:

"নিশ্চয়ই আমাকে কোরআন ও এর অনুরূপ (হাদিস) দান করা হয়েছে।"

(আবু দাউদ: ৪৬০৪)

(৩) প্রকৃতি ও সৃষ্টি জগত (তাকওয়াবানদের অন্তর্দৃষ্টি)

আল্লাহ বলেন,

"তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো কীভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন।"

(সূরা আনকাবুত: ২০)

প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের মধ্যে আল্লাহর অসীম জ্ঞানের নিদর্শন রয়েছে। বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

(৪) অধ্যয়ন ও গবেষণা

ইসলাম মানুষকে কেবল ধর্মীয় জ্ঞান নয়, বরং বিজ্ঞান, ইতিহাস, চিকিৎসা ইত্যাদি সব ধরনের উপকারী জ্ঞান অর্জনের জন্য উৎসাহিত করে।

নবী (সা.) বলেছেন:

"হিকমত (জ্ঞান) হলো মুমিনের হারানো সম্পদ, সে যেখানেই তা পাবে, গ্রহণ করবে।"

(তিরমিজি: ২৬৮৭)

এটি প্রমাণ করে যে, জ্ঞান শুধু কোরআন-হাদিস থেকে নয়, বরং যেকোনো উপকারী উৎস থেকেও নেওয়া যায়।

ইসলাম জ্ঞান অর্জনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক কাজ হিসেবে গণ্য করেছে। কোরআন ও হাদিসে জ্ঞানার্জনের ফজিলত, জ্ঞানীদের মর্যাদা এবং জ্ঞানের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাই প্রতিটি মুসলিমের উচিত জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হওয়া এবং তা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

আরবি ভাষা না জানার বিপদ

আমাদের ধর্মের মূল ভাষা আরবি। আল্লাহর কথা কুরআনের ভাষা আরবি। রাসূলের কথা হাদীসের ভাষা আরবি। আরবি না জানার কারণে আমরা সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা শুনে কিছুই বুঝি না। আমাদের দারস্থ হতে হয় অনুবাদের-যেটা করেছেন অন্য কোনো মানুষ। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ-র মতো কোনো কোনো মনীষী তো আরবি ভাষা শেখাকে ফরজ বলতেন।কিছু কিছু পরিবার বাচ্চাদের কেবল আরবি পড়তে শেখায়। অনেক পরিবার আজ তাও ছেড়ে দিয়েছে। আরবি পড়তে শেখানোর চেয়ে বাচ্চাকে ইংরেজিভাষী করায় অনেক আগ্রহ তাদের। কারণ, তাতে সমাজের চোখে স্মার্ট হওয়া যায়। ভবিষ্যতে অনেক কিছুতে এগিয়ে থাকা যায়। ইংরেজির গুরুত্বকে আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু দুনিয়াতে এগিয়ে থাকতে গিয়ে পরজীবনের পথে যে পিছিয়ে পড়ছি, সেটা কি একটু ভাবা প্রয়োজন না?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে শেখাতেন

(১) রূপক-উপমা ব্যবহার

বিমূর্ত কোনো বিষয় বোঝানোর জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূপক কাহিনি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতেন সাহাবিদের কাছে। একদিন তিনি সাহাবিদের বললেন, 'কারও বাড়ির সামনে যদি একটি নদী থাকে, আর তোমাদের কেউ যদি সেই নদীতে দিনে পাঁচবার গোসল করে, তার গায়ে কি কোনো ময়লা থাকবে?'

সাহাবিরা বললেন, 'নাহ, কোনো ময়লা থাকবে না।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ ঠিক এভাবে পাঁচ বার সালাত দিয়ে বান্দার অপরাধ মোচন করেন।'
(সহীহ বুখারী: ৫২৮; সহীহ মুসলিম: ৬৬৭)

(২) গল্পকাহিনি

বাচ্চাকাচ্চা তো বটেই, গল্প শুনতে সবাই পছন্দ করে। গুরুগম্ভীর তাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে বর্ণনামূলক কাহিনি মানুষের মনে সহজে গেঁথে যায়। মানুষকে আকৃষ্টও করে বেশি। কখনও কখনও তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের গল্পকাহিনি বলে ইসলামের অনেক বিষয় তুলে ধরতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'একবার এক লোক উটের পিঠে খাবারদাবার বোঝাই করে সফরে বের হলেন। যেতে যেতে পানিশূন্য এক মরুভূমিতে এসে তিনি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। একটা গাছের ছায়ায় বসতেই দু-চোখ ভেঙে ঘুম নামল। আর ঠিক তখন পালিয়ে গেল উটটা।ঘুম ভেঙে উটটাকে এদিক-ওদিক না পেয়ে এক টিলার ওপর উঠলেন ওটার খোঁজ পেতে-কিন্তু দেখা আর মেলে না। আরেকটি টিলায় উঠে দূরে চোখ মেললেন- দেখা নেই। তৃতীয় আরেকটি টিলায় উঠে তয়ার্ত চোখে উটটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজলেন-কোথাও ওটার ছায়া পর্যন্ত দেখতে পেলেন না। নিরাশ হয়ে লোকটা ফিরে এলেন যেখানে ঘুমিয়ে ছিলেন সেখানে। মাথা নিচু করে বসে ছিলেন তিনি। হঠাৎ উটটি এসে গলার দড়ি গলিয়ে দিল লোকটির হাতে। সে কী খুশি তার! কিন্তু কোনো বান্দা যখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তিনি এরচেয়েও অনেক বেশি খুশি হন।'

(৩)কসম কাটা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কখনও কিছু বলার আগে আল্লাহর কসম কাটতেন। এটা একদিকে শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করে, আবার কথার ভারও বাড়ায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বলছিলেন, 'আল্লাহর কসম সে বিশ্বাসী নয়, আল্লাহর কসম সে বিশ্বাসী নয়, আল্লাহর কসম সে বিশ্বাসী নয়।'
সাহাবিরা বললেন, 'কে আল্লাহর রাসূল?'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যার প্রতিবেশী তার থেকে নিরাপদ নয়। [২]

(৪)ধাপে ধাপে

মানুষের মনস্তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। বাস্তব জীবনে অনেক কিছুই বলামাত্র করে ফেলা যায় না বা হয় না। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মনের এসব বিষয় জানতেন বলে অনেক বিষয় হুট করে চাপিয়ে দিতেন না। ধাপে ধাপে করতেন। মানুষকে সময় দিতেন নতুন আচার-অভ্যাসে অভ্যস্ত হতে। সন্তানদের বেলাতেও আমরা এটা করতে পারি। একদিনে তাকে পাঁচবার সালাত পড়তে জোরাজুরি না করে ধাপে ধাপে তাকে অভ্যস্ত করে তুলতে পারি। প্রথমবারেই টানা ৩০ দিন সিয়াম পালন না করিয়ে আস্তে ধীরে কয়েক বছরে তাকে প্রস্তুত করতে পারি। এতে ইসলাম তাদের ওপর জোরপূর্বক চেপে বসবে না। স্বেচ্ছায় একে জড়িয়ে নেবে তারা।

(৫)ভালো কোনো বিকল্পের খোঁজ

মানুষের ভুল সংশোধনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালো বিকল্প বলে দিতেন। কারও নাম ধরে তিনি বলতেন না, বা কৈফিয়ত চাইতেন না। শুধু বলে দিতেন, কাজটা এভাবে নয়, ওভাবে করা উচিত। এতে ভুলকারী বিব্রত হতেন না সবার সামনে। অগোচরে নিজেকে শুধরে নিতেন।

একবার নবীজি দেখলেন কেউ একজন সিজদার জায়গায় থুতু ফেলেছে। তখন মসজিদের মেঝে ছিল কাচা। তো, ওটা চোখে পড়তেই ভীষণ রেগে গেলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। নিজের হাতে ওটা মুছে তিনি বললেন, 'মানুষ সালাতে দাঁড়িয়ে তার রবের সঙ্গে কথা বলে। ওই মানুষটির সামনে তখন আল্লাহ। সুতরাং, কাবাঘরের দিকে থুতু ফেলবে না। ফেলতে হলে ডানে-বায়ে অথবা পায়ের নিচে ফেলো।'
তিনি এরপর তার পোশাকের খুঁটে থুতু ফেলে আরেক পাশের খুঁট দিয়ে মুছে বললেন, 'আর নয়তো এভাবে।'
(সহীহ বুখারী: ৪০৫, সহীহ মুসলিম: ৫৫১)

(৬)মানবপ্রকৃতি বোঝা

মানুষ কোনো রোবট নয়। রক্তমাংসের আবেগী এক প্রাণ সে। মানুষের ভুল সংশোধন বা তাকে দিয়ে কিছু করাতে এসব মাথায় রাখা তাই জরুরি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যের দোষত্রুটি সংশোধনে অনেক ধৈর্য ধরতেন। কখনও হয়তো সরাসরি কিছু বলতেন না।

একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এক স্ত্রীর ঘরে ছিলেন। অন্য এক স্ত্রী সেই ঘরে বিশাল পাত্রে খাবার পাঠালেন। তা দেখে এই ঘরের স্ত্রীর মনে ঈর্ষা জাগল। তিনি খাবার-আনা দাসিটির হাতে বাড়ি দিলেন। তাতে খাবারও পড়ে গেল, পাত্রটিও ভেঙে দু-টুকরো হলো। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রীকে কোনো বকাঝকা করলেন না। সকৌতুকে বললেন, 'তোমাদের মায়ের বুঝি ঈর্ষা হচ্ছে!' (সহীহ বুখারী: ৫২২৫) দাসিটিকে তখন এই ঘর থেকে ভালো একটা পাত্র দিয়ে ফেরত পাঠালেন। আর নিজে সেই ভাঙা টুকরোগুলো তুলে পরিষ্কার করলেন।
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও কতোভাবে মানুষদের শেখাতেন, বোঝাতেন তা বলে শেষ করা যাবে না। তবে ওপরের এই পদ্ধতিগুলো থেকে বাবা-মায়েরা সন্তান মানুষ করার বিষয়ে কিছু ধারণা পাবেন। গৎবাঁধা চিরাচরিত নিয়মগুলোর বাইরে এসে সৃজনশীল চিন্তা করে ইসলামি আদর্শে বাচ্চাকাচ্চাদের মানুষ করার প্রেরণা পাবেন।

৭. সন্তানদের ইমানি শিক্ষা দেওয়া কেন জরুরি?

ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) এক গভীর বাস্তব কথা বলেছেন—
“যে ব্যক্তি তার সন্তানকে এমন কিছু শেখায় না যা তার দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য উপকারী, বরং তাকে অবহেলার সাথে বড় হতে দেয়—সে নিঃসন্দেহে গুনাহগার।”
আজ আমরা নিজেরাও স্বীকার করি, বহু সন্তান নষ্ট হয়ে যায় শুধুমাত্র বাবা-মায়ের অবহেলার কারণে। যখন আমরা তাদের ছোটবেলা থেকে ইসলামের ফরজ বিধান, কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা না দিই, তখন তারা ধীরে ধীরে এমন এক পথে পা বাড়ায়—যেখানে ঈমান, আখলাক, ও দায়িত্ববোধের কোনও ছায়া থাকে না। তখন তারা শুধু নিজেরাই বিপথে যায় না, বরং বাবা-মায়েরও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়—দুনিয়াতেও, আখিরাতেও।
🏵️ **গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা:**
আজ যদি আমরা সন্তানদের কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামী আদর্শে গড়ে না তুলি, তবে

তারা বড় হয়ে নিজেদের জীবনেও ব্যর্থ হবে এবং আমাদের হৃদয়ে অনুশোচনার আগুন জ্বালাবে।

🏵 **তাই করণীয়:**

✔ ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে দীনের মৌলিক শিক্ষা দেওয়া

✔ নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত, সালাত, আদব-আখলাকের চর্চা করা

✔ আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা

✔ ইসলামবিরোধী প্রভাব ও বিভ্রান্তিকর চিন্তার বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করা

✨ আসুন, সময় থাকতে আমরা নিজেদের দায়িত্বটুকু পালন করি। সন্তানদের সঠিক ঈমান, সলাত, চরিত্র, আদব ও আকীদার শিক্ষা দিই—যাতে তারা কেবল দুনিয়ার নয়, আখিরাতেও আমাদের জন্য উপকারি হয় ইনশাআল্লাহ।

দায়িত্ব শুরু হয় বিয়ের আগেই

সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব শুধু তার জন্মের পর থেকেই শুরু হয় না, বরং এই দায়িত্ব বিয়ের আগেই শুরু হয়ে যায়। ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে যে, **একটি সঠিক ও নৈতিক পরিবার গঠনের জন্য পিতা-মাতাকে তাদের জীবনসঙ্গী নির্বাচনের সময় থেকেই সতর্ক হতে হবে**। কারণ, সন্তানদের চারিত্রিক গুণাবলি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ অনেকাংশেই তাদের পিতা-মাতার ব্যক্তিত্ব ও পারিবারিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে।

সন্তান মানুষ করার আগে যা জানা জরুরি

১ .বিয়ের গুরুত্ব

সেই আদম-হাওয়া আলাইহিমাস সালাম থেকে চলে আসছে বিয়ে আর পরিবার। একে টিকিয়ে রাখতে উপযোগী বেশকিছু বিধি দেওয়া আছে আমাদের ইসলামে।

একটি পরিবার গড়ে ওঠে দাম্পত্য-সম্পর্ককে ঘিরে। এই সম্পর্ক ঠিক থাকা মানে সব ঠিক; এখানে অশান্তি মানে অন্য অনেক কিছুতেই অশান্তি। এই সম্পর্ক যতো সুন্দর যতো মধুর, পরিবার ততো সুন্দর, পারিবারিক বন্ধন ততো মজবুত।

ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব যে কতোটা তা বোঝা যায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা থেকে। তিনি বলেছেন-

যুবকেরা, তোমাদের যাদের সামর্থ্য আছে বিয়ে করো... । [সহীহ বুখারী: ৫০৬৫]

অন্য একবার বলেছেন, 'যে বিয়ে করল সে ঈমানের অর্ধেক পূরণ করল। সুতরাং বাকি অর্ধেক পূরণে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।' [সিলসিলাতুস সহীহাহ: ৬২৫]

বিয়ে এক ইবাদত। আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণের এক অনন্য উপায়। পুরুষ ও নারীকে তিনি সৃষ্টি করেছেন একটিমাত্র আত্মা থেকে। তাদের মধ্যে জুড়ে দিয়েছেন বিয়ের মতো পবিত্র বন্ধন। স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের মাঝে খুঁজে পায় শান্তি, হৃদয়ের উষ্ণতা। দুজনে মিলে একে অন্যকে তারা সাহায্য করে আল্লাহর আনুগত্যে। [সূরা রুম, আয়াত: ২১]

বিয়ে যেহেতু ইবাদত, খেয়াল রাখতে হবে এই ব্যাপারে যেন আল্লাহর আদেশের অন্যথা না হয়। এখানে যেন আমরা এমন কিছু না করি যা তাঁর রোষের কারণ হয়। আল্লাহর ভালোবাসা ও আনুগত্যে দুজনকে এগোতে হবে হাতে হাত ধরে। মনে ঈমান এবং আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা-মাখা ভয় বাড়াতে অর্জন করতে হবে ইসলামি জ্ঞান। জীবনের সিদ্ধান্তগুলো হতে হবে কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে।

২. উত্তম জীবনসঙ্গী নির্বাচন

ধর্মপরায়ণ নারীকে গ্রহণ করো, তাহলে তুমি কল্যাণ লাভ করবে।"* (সহিহ বুখারি, ৫০৯০)

ইসলাম উত্তম জীবনসঙ্গী নির্বাচনকে কেন গুরুত্ব দেয়?

- সন্তানদের ভবিষ্যৎ গঠনে মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই, একজন ধর্মপরায়ণ ও নৈতিক নারী সন্তানদের সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারে।
- একইভাবে, একজন ধার্মিক ও নৈতিক পুরুষ তার স্ত্রী ও সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে।
- পরিবারই হচ্ছে সন্তানদের প্রথম শিক্ষালয়, তাই উত্তম চরিত্রের পিতা-মাতা সন্তানদের ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

(২) কুরআন ও হাদিস থেকে শিক্ষা:

(ক) কুরআন ও হাদিসে উত্তম জীবনসঙ্গী নির্বাচনের নির্দেশনা:

- হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া: *"হে আমার রব! আমাকে পবিত্র সন্তান দান করো।"* (সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৮)
- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"নারীকে চারটি কারণে বিবাহ করা হয়: তার সম্পদ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য ও ধর্মপরায়ণতা। তবে তুমি ধর্মপরায়ণ নারীকে গ্রহণ করো, তাহলে তুমি কল্যাণ লাভ করবে।" (সহিহ বুখারি, ৫০৯০)

➤ এই হাদিস স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, একজন ব্যক্তির উচিত তার জীবনসঙ্গী নির্বাচনের সময় ধর্ম ও নৈতিকতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া।

- আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন:

"সৎ নারী তার স্বামীর অনুগত হয় এবং আল্লাহ যা সংরক্ষণ করতে বলেছেন, তা গোপন রাখে।" (সূরা আন-নিসা: ৩৪)

একটি ইসলামি পরিবার গড়তে বাকি সবকিছুর চেয়ে দরকার ধর্মীয় জ্ঞান আর ঈমান।

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী দুজনের মাঝে মমতা আর বিবেচনাবোধ থাকতে হবে। যার যার দায়িত-কর্তব্য পালন করতে হবে যথাসাধ্য। স্ত্রীর কোনো একটা কিছু ভালো না লাগলেই তার সাথে আজেবাজে আচরণ করা শোভনীয় নয়। সুমহান আল্লাহ বলেছেন-

তাদের সাথে দয়ামায়ার সম্পর্ক বজায় রাখো। যদি তাদের কোনোকিছু অপছন্দ হয়-হয়তো তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছ, যার মাঝে আল্লাহ কোনো কল্যাণ রেখেছেন। (সূরা নিসা, আয়াত: ১৯)

সুতরাং,

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

যার ব্যবহার ভালো বিশ্বাসী মুসলিমদের মাঝে সে সবচেয়ে ভালো। আর স্ত্রীর সাথে যার ব্যবহার ভালো, তোমাদের মাঝে সে সবচেয়ে ভালো।[১]

দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা-মমতা-দরদের মতো নানা মানবীয় গুণের সমাহার থাকা লাগবে। স্ত্রীর প্রতি স্বামী হবেন উদার, যত্নশীল। তাকে দেবেন নিরাপত্তা। অন্যদিকে স্ত্রী হবেন স্বামীর অনুগত। তাকে সম্মান করবেন।

একটা সম্পর্কের মাঝে একে অপরের প্রতি আস্থা, সম্মানবোধ, সহযোগিতা, বিশ্বাস আর সমঝোতা না থাকলে সেই সম্পর্ক বেশিদিন টেকে না। এখানে নিজের ইচ্ছের আগে প্রাধান্য দিতে হয় সঙ্গীর ইচ্ছেকে। এভাবে এগিয়ে গেলে সম্পর্কে একটা ছন্দ পাবেন; সংসারও মধুময় হয়ে উঠবে অনাবিল শান্তিতে।

বিয়ে এক আশীর্বাদ; তবে আল্লাহর তরফ থেকে এটা পরীক্ষাও। একটা দাম্পত্য- সম্পর্কে পরস্পরের প্রতি দরদ থাকা জরুরি। একে অন্যকে বোঝা, অন্যের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেওয়া, নিজেদের ব্যাপারে একটা ক্ষমাপরায়ণ মনোভাব থাকা প্রয়োজন। স্ত্রীর জন্য স্বামীকে বা স্বামীর জন্য স্ত্রীকে কখনও কখনও আত্মত্যাগ করতে হবে। নিজেদের মাঝে সবর করতে

হবে। মেনে নিতে হবে অন্যের ভুল বা দুর্বলতা। কারও মাঝে ইসলাম বহির্ভূত কিছু দেখা গেলে সুন্দর করে বুঝিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সমস্যা দেখা দিলে সুস্থ আলোচনা করে বিহিত করতে হবে। সবার আগে সুমহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। ভরসা রাখতে হবে তাঁর দিশা আর সিদ্ধান্তে।

৩.নৈতিক ও ধার্মিক জীবনসঙ্গীর গুরুত্ব:

একজন ধার্মিক ও সৎ জীবনসঙ্গী শুধু একজন ভালো স্বামী বা স্ত্রীই নয়, বরং সে একজন আদর্শ পিতা বা মাতা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে। ইসলামে জীবনসঙ্গী নির্বাচনের অন্যতম মাপকাঠি হলো তার ধর্মীয়তা ও চরিত্র। কারণ একজন নৈতিক ও ধার্মিক জীবনসঙ্গী সংসারে শান্তি, সৌহার্দ্য এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। তারা সন্তানের নৈতিকতা ও বিশ্বাস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সন্তানরা যাদের পরিবারে সত্যবাদিতা, ধৈর্য, দয়া ও তাকওয়ার চর্চা দেখে বড় হয়, তারা নিজেরাও সেই আদর্শ অনুসরণে অনুপ্রাণিত হয়। তাই পরিবার গঠনের শুরুতেই যদি জীবনসঙ্গী নির্বাচনে সচেতন থাকা যায়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সঠিক পথের অনুসারী হয়ে উঠবে ইন শা আল্লাহ।

নেক সন্তান কামনায় দোয়া করা ও শারীরিক সম্পর্কের আগে দোয়া পাঠ করা

(১) কেন নেক সন্তান কামনা করা উচিত?

- সন্তান শুধু দুনিয়ার জন্য নয়, বরং আখিরাতের জন্যও একটি বড় নিয়ামত।
- যদি সন্তান সৎ ও ধার্মিক হয়, তবে সে দুনিয়া ও আখিরাতে পিতা-মাতার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।
- একজন নেক সন্তান মৃত্যুর পরেও তার পিতা-মাতার জন্য দোয়া করতে পারে, যা কিয়ামত পর্যন্ত তার পিতা-মাতার আমলনামায় সওয়াব হিসেবে জমা হতে থাকে।

(২) কুরআন ও হাদিস থেকে দোয়ার উদাহরণ:

- হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া:

"হে আমার রব! আমাকে আপনার পক্ষ থেকে এক পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দোয়াগুলো শুনে থাকেন।" (সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৮)

➤ এই আয়াতে দেখা যায়, হযরত যাকারিয়া (আ.) আল্লাহর কাছে একজন পবিত্র ও ধার্মিক সন্তান চেয়েছেন, যা আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

- হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর দোয়া:

"হে আমার রব! আমাকে সালেহ (সৎ) সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করুন।" (সূরা আস-সাফফাত, ১০০)

➤ এটি বোঝায় যে, নবীরা পর্যন্ত তাদের সন্তানদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন, তাই আমাদেরও উচিত নেক সন্তান লাভের জন্য দোয়া করা।

(৩) সহবাসের আগে দোয়া পড়া: সন্তানের কল্যাণের জন্য পিতা-মাতার দায়িত্ব

ইসলামে শুধু সন্তান জন্ম দিলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, বরং সন্তান যেন শয়তানের কুমন্ত্রণায় না পড়ে এবং সৎ ও নেক সন্তান হয়, সে জন্য পিতা-মাতা আগে থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্বামী-স্ত্রী শারীরিক সম্পর্কে মিলিত হওয়ার আগে একটি বিশেষ দোয়া পড়তে হবে, যাতে শয়তান সেই সন্তানকে ক্ষতি করতে না পারে।

◇ দোয়া:

اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

উচ্চারণ:
"আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বানা, ওয়া জান্নিবিশ শাইত্বানা মা রাযাকতানা"

বাংলা অর্থ:
"হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং আমাদের যে সন্তান দান করবেন, তাকেও শয়তান থেকে রক্ষা করুন।" (সহিহ বুখারি, ১৪১)

(৪) এই দোয়া পড়ার গুরুত্ব:
☑ সন্তান শয়তানের কুমন্ত্রণার শিকার হয় না।
☑ সন্তান শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকে।
☑ সন্তানের চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলি ভালো হয়।
☑ দাম্পত্য জীবন বরকতময় হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যদি তোমাদের কেউ তার স্ত্রীসহ মিলিত হওয়ার সময় এই দোয়া পড়ে এবং যদি সেই মিলন থেকে কোনো সন্তান জন্ম নেয়, তবে শয়তান কখনো তাকে ক্ষতি করতে পারবে না।" (সহিহ বুখারি, ১৪১)

👉 এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, একটি নেক সন্তান জন্মদানের দায়িত্ব শুধুমাত্র জন্মের পর শুরু হয় না, বরং এটি শারীরিক সম্পর্কের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত]

৩. সুস্থ ও নৈতিক পরিবার গঠনের প্রস্তুতি

(১) কেন প্রস্তুতি প্রয়োজন?

- একটি ভালো পরিবার গঠনের জন্য শুধু ভালো জীবনসঙ্গী নির্বাচন করাই যথেষ্ট নয়, বরং সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালনের জন্য মানসিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক প্রস্তুতি নেওয়াও প্রয়োজন।
- দাম্পত্য জীবনের শুরু থেকেই আদর্শ পরিবার গঠনের পরিকল্পনা করা উচিত।
- সুস্থ সন্তান জন্মানোর জন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাস, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও হালাল রিজিক নিশ্চিত করা জরুরি।

সন্তান মানুষ করার দায়িত্ব

বাচ্চা মানুষ করার আগে স্বামী-স্ত্রী দুজনের মাঝে সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা জরুরি। একটি পরিবারের মূলে রয়েছে বিয়ে-সুতরাং, সবার আগে দরকার বৈবাহিক সম্পর্কের সুস্থতা। এটা সন্তানের সুস্থ মানসিক বিকাশের পূর্বশর্ত।
দাম্পত্য-সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের জানতে হবে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে। এরপর যা জানলাম তা পালন করতে হবে। বাচ্চাকাচ্চাকে শাসন (সংশোধন করার জন্য) করা বা বড় করার কৌশল নিয়ে আগে থেকেই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নেওয়া ভালো। এতে করে এসব নিয়ে পরে ঝামেলা বাঁধবে না। সন্তান মানুষ করার কাজটি বেশ কার্যকর হবে।

আপনারা আপনাদের সন্তানের সবচেয়ে বড় আদর্শ। তাদের ওপর আপনাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। ওরা আপনার কথা যতোটা না কান দিয়ে শোনে, তারচেয়ে বেশি শোনে চোখ দিয়ে। মানে, আপনি কী বলছেন, তারচেয়ে ওরা বেশি গুরুত্ব দেবে আপনি কী করছেন তার ওপর। সুতরাং, খেয়াল রাখবেন, যা বলছেন তা করছেন কি না।

গবেষণায় দেখা গেছে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া বাচ্চাদের মানসিক বিকাশে অনেক সময় সমস্যা করে। কাজেই বাচ্চাদের সামনে ঝগড়া না করার চেষ্টা করবেন যতোটুকু পারেন। ওদের সামনে হবেন ধৈর্য আর আপসকামী মানসিকতার পরাকাষ্ঠা।

বাবা-মায়ের পৃথক দায়িত্ব

পুরুষ ও নারী প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন। এ কথা অস্বীকার করার জো নেই। নারী-পুরুষের মস্তিষ্কের গঠন এবং স্বভাব-চরিত্র-মনস্তত্ত্ব আলাদা। আল্লাহ এজন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুজনের জন্য দু-ধরনের কাজের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন-

স্বামী তার স্ত্রীর তত্ত্বাবধায়ক। কারণ, আল্লাহ তাদের বিশেষ কিছু সামর্থ্য দিয়েছেন। আর তারা নিজেদের আয়রোজগারও ব্যয় করে তাদের পেছনে।

(সুরা আহ্ নিসা ,আয়াত:৩৪)

পুরুষ হলেন ঘরের কর্তা। পরিবারের নেতা। সংসারের যাবতীয় খোরপোশের দায়দায়িত্ব তার। অন্যদিকে নারীর প্রধান দায়িত্ব সন্তানকে নীতিবান হিসেবে গড়ে তোলা, আর ঘরসংসারের দেখভাল করা। স্বামী যদি আল্লাহর আদেশ-বিরুদ্ধ কিছু করতে না বলে, তবে তার কথা শোনা স্ত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক। একটি পরিবার ঠিকঠাকমতো চলার জন্য প্রত্যেকের যার যার দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করা জরুরি। এটা আল্লাহর করে দেওয়া বিভাজন। এখানে হাত দিলে পারিবারিক জীবন হবে অস্থিতিশীল

ও নারীর পৃথক পৃথক দায়িত্ব অন্য বেশকিছু ধর্ম ও সংস্কৃতিতেও দেখা যায়। অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পশ্চিমাবিশ্ব নারীকে কর্মক্ষেত্রে টেনে এনে তাদের সমান অধিকার দেওয়ার একটা ধোঁয়া তুলছে। সন্তান মানুষ করার কাজটাকে তারা খুব মামুলি একটা কাজ হিসেবে দেখাতে চায়। তারা দেখাতে চায়, এরচেয়ে বরং একজন নারীর ক্যারিয়ার আর স্বাধীনতা খুব মহৎ কিছু। এসব ছেলেভোলানো কথা দিয়ে নারীদের তারা প্রলুব্ধ করতে চায়। তাদের সেই ঢেউ আজ মুসলিম সমাজেও আছড়ে পড়ছে। এর বিপরীতে বাঁধ তৈরি না করা গেলে নদীর পার ভাঙতে বেশি সময় লাগবে না।

মাতৃত্ব অতি সম্মানজনক 'পেশা'

একবার এক লোক নবীজিকে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, দুনিয়ার সব মানুষের মধ্যে আমার থেকে দয়া আর ভালো আচরণ পাওয়ার দাবিদার কে?'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমার মা।'

'এরপর?'

'তোমার মা।'

'এরপর?'

'তোমার মা।'

'তারপর?'

'তোমার বাবা।'
(সহীহ বুখারী: ৫৯৭১, সহীহ মুসলিম:২৫৪৮)

ইসলাম মায়েদের যে কতো সম্মান দিয়েছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে এ-হাদীস থেকে। মাতৃত্বের মাঝে একজন নারী যে-পূর্ণতা, যে-তৃপ্তি পান, তা আর অন্য কিছুতে তিনি পান না। পৃথিবীতে মা হবার দায়িত্ব একজন নারীর জীবনে সবচেয়ে দামি কাজ। উম্মাহর পরবর্তী প্রজন্ম এবং সমাজের ভিত্তি গড়ার মহান দায়িত্ব তার হাতে। ইসলাম এজন্য মাকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে সবচেয়ে বেশি।

সন্তানদের প্রতি মায়ের যে-মমতা তা আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

আল্লাহ যেদিন মহাকাশমালা আর পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, সেদিন একশোটি ভাগে মমতাও সৃষ্টি করলেন। এর একেকটা ভাগ মহাকাশ ও পথিবীর মাঝব্যাপী দূরত্বের মতো বিশাল। এই মমতার একটা অংশ তিনি পৃথিবীতে ঢেলে দিয়েছেন। আর এ কারণে একজন মা তার সন্তানের প্রতি মমতাময়ী হন। [১] [১] সহীহ মুসলিম: ২৭৫৩

সন্তান মানুষ করার মতো গুরুদায়িত্ব পালনের উপযোগী করে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন নারীদের। বাচ্চাদের বেলায় একজন নারী যে-পরিমাণ ধৈর্য-মায়া-দরদ দেখাতে পারেন সাধারণত, তা পুরুষেরা পারেন না। ভালোবাসার ছোঁয়ায় গড়া একটি শান্তিনিকেতনের জন্য নারীদের অবদানের বিকল্প নেই।

মায়ের দায়িত্ব পালন এক অসামান্য গুরুত্বের কাজ। সেই যে গর্ভধারণ থেকে শুরু- তারপর সন্তান প্রসব, শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো, ধীরে ধীরে পেলেপুষে বড়ো করা-অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ এগুলো। নির্বিঘ্নে তারা যেন এসব কাজ করতে পারে সেজন্য পরিবারের মাধ্যমে আল্লাহ তাদের আর্থিক সমর্থনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন

মায়েদের চাকরি-বাকরি

একজন মায়ের জন্য বাইরে গিয়ে কাজ করা অত্যাবশ্যকীয় নয়। সন্তান মানুষ করার গুরুদায়িত্ব তার প্রথম কাজ। এই দায়িত্ব অবহেলা করে বাইরে কাজ করলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে সন্তানের ওপর। আর একদিকে অফিস, আরেকদিকে বাচ্চাকাচ্চা-উভয় দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হবে তাকে। মায়েদের বোঝা উচিত, ঠিকঠাকমতো মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনের মাঝেই নিহিত রয়েছে তার সাফল্য, তার পুরস্কার।

কখনও কখনও আমাদের নারীদের কাজ করা জরুরি হতে পারে। হয়তো সংসারের খরচ স্বামী একা সামলাতে পারছেন না; কিংবা ডাক্তার, দাই-মা বা শিক্ষকতার মতো কিছু সামাজিক পেশায় নারীদের না হলে চলছে না। এসব ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ সামষ্টিক দায়। মানে সমাজের কেউ কেউ যদি এ-দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে বাকিদের ওপর তার দায় থাকে না। তবে কাজগুলো করতে গিয়ে সূক্ষ্মভাবে লাভ-ক্ষতির হিসেব করে নিতে হবে। কারণ, সামাজিক দায়দায়িত্বের চেয়ে আমাদের ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের গুরুত্ব আগে।

মুসলিম নারীদের চাকরি-বাকরি একেবারে নিষিদ্ধ নয় ইসলামে। তবে এজন্য বেশকিছু শর্ত-দিকনির্দেশনা আছে। এগুলো মেনে চলা ব্যক্তি ও সমাজ-উভয়ের জন্য কল্যাণজনক:

>স্ত্রীকে প্রথমে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। কারণ, তার চাকরিতে যোগ দেওয়া পরিবারের জন্য আসলেই কতোটা ভালো হবে, সে-সম্বন্ধে সামীর ভালো ধারণা থাকতে পারে।

>চাকরি-বাকরি করতে গিয়ে পরিবার ও সন্তানদের দেখভালের বিষয়টি অবহেলা করা যাবে না। তার অনুপস্থিতিতে যেন সংসারের ক্ষতি না হয়।

>কাজটি যেন ইসলামি আদর্শ এবং নারীদের বিশেষ প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায়।

>যেসব কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সেগুলো এড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।
>পোশাক-আশাক, কথাবার্তায় ইসলামি আদর্শ মেনে চলতে হবে।

বাবার দায়িত্ব

বাবা আসলে একটি পরিবারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সংসার চালানো থেকে শুরু করে পরিবারের সবার ভালোমন্দের খোঁজখবর রাখা-সবই তার দায়িত্ব। নিজের আর্থিক সামর্থ্য এবং সামাজিক প্রচলন অনুযায়ী তিনি পরিবারের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবেন। এই দায়িত্বে অবহেলা করা গুরুতর অপরাধ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

"কোনো ব্যক্তির ওপর যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব ন্যস্ত, তাদের অবহেলা করা সেই ব্যক্তির জন্য অপরাধ" (সুনানু আবি দাউদ: ১৬৯৪)
পরিবারে বাবার আদেশই শেষ কথা। তবে এর মানে এই না যে, তিনি পারিবারিক বিষয়ে অন্যদের সাথে পরামর্শ করবেন না। কিংবা তিনি কখনও কোনোকিছুতে

আপস করবেন না। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তার হাতে। পরিবারে তিনি সর্বোচ্চ সম্মান ও আনুগত্যের অধিকারী।
সন্তান মানুষ করায় বাবাকেও হাত লাগাতে হবে মায়ের সাথে। বাচ্চা বড় করা যে কেবল মায়ের একার দায়িত নয়-এটা যেন বাবারা স্মরণে রাখেন। সন্তান ঠিকমতো ইসলামি শিক্ষা পাচ্ছে কি না এসব বিষয় তাকে খেয়াল রাখতে হবে। সন্তানদের যথেষ্ট সময় দিয়ে সহজ করতে হবে তাদের আত্মিক-মানসিক-বদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ। সংসার শুধু রমণীর একার গুণে নয়; নর-নারী উভয়ের সমবেত অংশগ্রহণে সুখী হয়।

বাবাদের চিরাচরিত রূপে দেখা যায়, তারা সবসময় বাচ্চাদের শুধু শাসন করেন। মারধর করেন। সন্তানদের সাথে তাদের কেমন একটা দূর দূর সম্পর্ক থাকে। যেন বাবা হলে সন্তানদের আদর করা নিষেধ। তাদের সাথে খেলাধুলো-গল্পগুজব করা মানা। অথচ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে এর উল্টোটাই আমরা দেখি।

আজকের ছেলে ভবিষ্যতের দায়িত্ববান পুরুষ হিসেবে গড়ে ওঠায় বাবাকে রাখতে হবে অগ্রণী ভূমিকা। ছোটবেলা থেকে তিনি সন্তানকে পুরুষদের দায়দায়িত্ব, পুরুষালি স্বভাব সম্বন্ধে সচেতন করবেন। বাবা হলেন সন্তানদের প্রথম অনুকরণীয় আদর্শ। বাবা কর্মঠ হলে ছেলেমেয়েরা সহজে কুঁড়ে হয় না। একজন মুসলিম বাবা সন্তানদের শুধু বাবা নন; তিনি একাধারে অনুকরণীয় আদর্শ, শিক্ষক, বন্ধু, উৎসাহদাতা। বাস্তব জীবনের বহু মূল্যবান উপদেশ আর পরামর্শ আসে তার কাছ থেকে।

সন্তান মানুষ করায় বাবাদের ভূমিকা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে পশ্চিমে। ইউএস ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব চাইল্ড হেলথ এ্যান্ড হিউম্যান ডিভেলপমেন্ট-এর একটি গবেষণায় দেখা গেছে বাবার সান্নিধ্য পাওয়া শিশুর সামাজিক দক্ষতা বেশি। পড়াশোনাতেও এমন শিশুরা ভালো করে। ভবিষ্যতে এদের মধ্যে আচরণগত সমস্যা থাকে কম।

তার মানে বাবাদের যেসব দায়িত্বের কথা ইসলাম বহু আগে থেকেই বলছে, আধুনিক গবেষণাতেও তার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে।

সবার আগে নিজেদের ঈমান

সন্তানের মাঝে ঈমান গেঁথে দিতে বাবা-মাদের আগে নিজেদের ঈমান পোক্ত করতে হবে। আমাদের এ-বইটি কিন্তু শিশুদের জন্য না; বাবা-মাদের জন্য।

অন্যকে শেখাতে গেলে নিজে বেশি শেখা যায়। শিশুদের ঈমানের তালিম দিতে গিয়ে দেখবেন, নিজেরই ঈমান ঝালাই হচ্ছে। এ ছাড়া নিজেরা বইপত্র পড়বেন, ইবাদত বাড়াবেন, মুসলিম সমাজের জন্য কাজ করবেন। এগুলোও আপনাদের ঈমান মজবুত করবে। বাচ্চাদের মাঝে ঈমান সঞ্চারের কাজটা সহজ হবে তাতে।

সন্তানের প্রতি দায়িত্ব শুধু তার জন্মের পর থেকেই শুরু হয় না, বরং এর প্রস্তুতি বিয়ের আগেই নিতে হয়**। একজন নৈতিক, ধার্মিক ও সদাচারী জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা, **নেক সন্তান কামনায় দোয়া করা এবং **শারীরিক সম্পর্কের আগে দোয়া পাঠ করা**—এই তিনটি বিষয় একটি আদর্শ পরিবার গঠনের মূল চাবিকাঠি।

ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে যে, একজন নেক ও ধর্মপ্রাণ সন্তান শুধু দুনিয়ার জন্য নয়, বরং আখিরাতেও পিতা-মাতার জন্য রহমত ও সওয়াবের কারণ হয়। তাই, আমাদের উচিত

জীবনসঙ্গী নির্বাচনের সময় ধর্মীয় ও নৈতিক দিককে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া এবং আল্লাহর কাছে নেক সন্তান কামনা করা, যাতে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারে।

গর্ভকালীন সময় ও শিশুর জন্ম

সন্তান একজন পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর দেওয়া সবচেয়ে বড় নিয়ামত ও দায়িত্ব। শিশুর শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সুস্থতা নিশ্চিত করা পিতা-মাতার কর্তব্য। তাই ইসলামে গর্ভকালীন সময় থেকে শুরু করে শিশুর জন্মপরবর্তী বিভিন্ন করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

১. গর্ভধারণকালীন সময় পিতা-মাতার করণীয়

শিশুর স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনের ভিত্তি গড়ে ওঠে গর্ভকালীন সময় থেকেই। এ সময় পিতা-মাতার উচিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মেনে চলা, যা শিশুর ভবিষ্যতের উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

(১) হালাল রিজিক নিশ্চিত করা

☑ **গর্ভাবস্থায় মায়ের খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রা সরাসরি শিশুর ওপর প্রভাব ফেলে।**

☑ **শরীরে প্রবেশ করা প্রতিটি খাদ্য উপাদান শিশুর মানসিক ও চারিত্রিক গঠনে ভূমিকা রাখে।**

☑ তাই পিতা-মাতার উচিত **শুধুমাত্র হালাল উপার্জন থেকে খাবার গ্রহণ করা এবং হারাম বা সন্দেহযুক্ত খাবার থেকে দূরে থাকা।**

☑ **আল্লাহ বলেন:**

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করো তার হালাল ও পবিত্র অংশ থেকে খাও।"

(সূরা বাকারা, ২:১৭২)

☑ **রাসূল (সা.) বলেছেন:**

كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

"যে দেহ হারাম খাদ্যে গঠিত, জান্নাতে তার স্থান হবে না।" (তিরমিজি, ৬১৪)

➤ **হালাল রিজিক নিশ্চিত করলে সন্তানও নৈতিক ও সৎ হয়ে বেড়ে উঠবে।**

(২) মায়ের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের যত্ন

☑ **মায়ের সুস্থতা সন্তানের সুস্থতার জন্য অপরিহার্য।**

☑ গর্ভাবস্থায় মায়ের মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা ও নেতিবাচক আবেগ শিশুর উপর খারাপ প্রভাব ফেলে।

☑ পিতা ও পরিবারের উচিত **মায়ের প্রতি ভালো ব্যবহার করা, সহানুভূতি দেখানো এবং মানসিক শান্তি প্রদান করা।**

☑ **রাসূল (সা.) বলেছেন:**

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ

"নারীদের প্রতি সদয় হও, কারণ তারা কোমল হৃদয়ের অধিকারী।" (সহিহ বুখারি, ৩১৪৯)

➤ **শান্তিপূর্ণ ও ইতিবাচক পরিবেশ শিশুর মানসিক বিকাশে সাহায্য করে।**

২. নবজাতকের জন্য প্রথম করণীয়

শিশুর জন্মের পরপরই ইসলামে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল করার নির্দেশনা রয়েছে, যা তার জীবনকে বরকতময় ও নিরাপদ করে তোলে।

(১) আজান ও ইকামত দেওয়া

☑ নবজাতকের জন্মের পর **ডান কানে আজান** এবং **বাম কানে ইকামত** দেওয়া সুন্নত।

☑ এর মাধ্যমে শিশুর **প্রথম শোনা শব্দ হয় আল্লাহর নাম**।

☑ এটি **শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে এবং শিশুর অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে।**

☑ **হাদিস**

:

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ

"যখন নবজাতকের কানে আজান দেওয়া হয়, তখন সে শয়তানের ধোঁকা থেকে নিরাপদ থাকে।" (আবু দাউদ, ৫১০৭)

➤ আজান ও ইকামতের মাধ্যমে শিশুর জীবনের শুরু হয় আল্লাহর স্মরণ দিয়ে।

(২)বুকের দুধ খাওয়ানোর সাথে আত্মিক বন্ধন

সন্তান প্রতিপালন ও দুধপান করানোর ফযীলত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে মহিলা সন্তান গর্ভে ধারণ করে, জন্মদান করে এবং দুধপান করায় তার মর্যাদা আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত রক্ষীর মত। গর্ভধারণ হতে দুধপান করানোর মধ্যবর্তী সময়ে মহিলা যদি মারা যায়, তবে সে শহীদের সমান সওয়াব পায়।

(কিসওয়াতুন্ নিসা, বেহেশতী যেওর ৮: ৪৬৬)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, মাতা সন্তানকে দুধ পান করালে প্রতি ঢোকের বিনিময়ে, মাতা এত পরিমাণ সওয়াব পায়, যেমন কেউ কোন প্রাণীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলে পেয়ে থাকে। যখন মাতা সন্তানের দুধ ছাড়িয়ে দেয়, তখন ফিরিশতা তার কাঁধে হাত রেখে বলে, তোমার অতীত জীবনের সমস্ত পাপ মাফ হয়ে গিয়েছে। সামনে কোন গুনাহ করলে তাই শুধু লেখা হবে।

হযরত থানবী (রহ:) বলেন, এখানে গুনাহ দ্বারা সগীরা গুনাহ উদ্দেশ্য। কিন্তু তারপরেও সমস্ত সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়া কম কথা নয়।

(কিসওয়াতুন নিসা, বেহেশতী যেওর ৮: ৪৬৭)

নবজাত শিশুর জন্য মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নেই। এটা শুধু শিশুকে শারীরিকভাবে সবল রাখে না; মা ও সন্তানের মধ্যে অদ্ভুত এক আত্মার বন্ধন গড়ে তোলে। শারীরিক কোনো সমস্যা না থাকলে শিশুকে বুকের দুধ পান করানো থেকে বঞ্চিত করা একেবারেই উচিত নয়। সুমহান আল্লাহ বলেছেন-

আর মায়েরা তাদের সন্তানদের টানা দু-বছর দুধপান করাবে। এটা তার জন্য, যে দুধপান করাবার মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়।(সূরা বাকারা আয়াত :১৩৩)

এজন্য সন্তানকে দুধ পান করানোর প্রচণ্ড তাগিদ দেওয়া হয় ইসলামে। এটা শিশুর জন্মগত অধিকার।

সন্তানের সাথে বাঁধন

সন্তান-প্রসবের পরবর্তী দিন-মাসগুলো মা ও সন্তানের জন্য খুব আবেগী সময়। এ সময় বাচ্চা যেমন মায়ের ওম চায়, মা চান সন্তানের স্পর্শ। মা ও শিশুর মধ্যে এক অদ্ভুত অপূর্ব বাঁধন গড়ে ওঠে এ-সময়টায়।

মায়ের প্রতি কচি শিশুর মনে তৈরি হয় আস্থা। কান্না করে সে সংকেত দেয়; কারণ, সে জানে তার এই সাংকেতিক ভাষা বুঝবে কেবল তার মা। মাতৃত্ব হয় মধুময়।

বাচ্চা বড় হয়। মায়ের আদরে ডুবে থেকে কৌতূহলী মন নিয়ে সে বেড়ে ওঠে। সে বোঝে সে নিরাপদ। তার মানসিক বিকাশ হয় দ্রুত। একটু বড় হলে ভিন্ন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে তাকে বেগ পেতে হয় না তেমন। মায়েদের সাথে যেসব সন্তানের বাঁধন এমন নয়, তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। সবকিছুতে মানিয়ে নিতে পারে না সহজে।

(২) ভালো অর্থবহ নাম রাখা

ভালো নাম রাখা পিতা-মাতার সর্বপ্রথম দায়িত্ব। আমরা এভাবেও বলতে পারি যে, পিতা-মাতার উপর সন্তানের সর্বপ্রথম হক হচ্ছে, তার জন্য সুন্দর নাম নির্বাচন করা।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه.

অর্থ : সন্তানের সুন্দর নাম রাখা ও তার উত্তম তারবিয়াতের ব্যবস্থা করা বাবার উপর সন্তানের হক। -মুসনাদে বাযযার (আলবাহরুয যাখখার), হাদীস ৮৫৪০

মানসিকতা ও স্বভাবের উপরও নামের একটা প্রভাব থাকে।

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، قَالَ :جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، فَحَدَّثَنِي :أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :مَا اسْمُكَ؟ قَالَ :اسْمِي حَزْنٌ، قَالَ :بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ .قَالَ: مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ :فَمَا زَالَتْ فِينَا الحُزُونَةُ بَعْدُ.

আবদুল হুমাইদ বিন শায়বা বলেন, আমি হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের কাছে বসা ছিলাম। তিনি তখন বললেন, আমার দাদা ‘হাযান’ একবার নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলেন। নবীজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? দাদা বললেন, আমার নাম হাযান। (হাযান অর্থ শক্তভূমি) নবীজী বললেন- না, তুমি হচ্ছ ‘সাহল’ (অর্থাৎ তোমার নাম হাযানের পরিবর্তে সাহল রাখো; সাহল অর্থ, নরম জমিন।) দাদা বললেন, আমার বাবা আমার যে নাম রেখেছেন আমি তা পরিবর্তন করব না। সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন, এর ফল এই হল যে, এরপর থেকে আমাদের বংশের লোকদের মেযাজে রুঢ়তা ও কর্কশভাব রয়ে গেল। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬১৯৩

সুন্দর নাম রাখার গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হল, হাশরের ময়দানে- সেখানে পূর্বাপর সকল মানুষ একত্রিত হবে এবং ব্যক্তিকে তার নাম ও তার বাবার নামসহ ডাকা হবে।

হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ.

কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে ডাকা হবে তোমাদের ও তোমাদের বাবার নাম নিয়ে (অর্থাৎ এভাবে ডাকা হবে- অমুকের ছেলে অমুক)। তাই তোমরা নিজেদের জন্য সুন্দর নাম রাখ। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৪৮)

☑ **নাম শিশুর আত্মপরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ**। তাই, **অর্থবহ, সুন্দর এবং ইসলামিক নাম রাখা উচিত।**

☑ নাম যেন **অশালীন, নেতিবাচক বা অর্থহীন না হয়**।

☑ সবচেয়ে উত্তম নাম:

- **আব্দুল্লাহ** (আল্লাহর বান্দা)
- **আব্দুর রহমান** (পরম দয়ালু আল্লাহর বান্দা)
- **নবীদের নামে নাম রাখা** যেমন: **ইবরাহিম, মূসা, ঈসা, ইউসুফ ইত্যাদি।**

☑ **রাসূল (সা.) বলেছেন**

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের সুন্দর নাম দাও, কারণ কিয়ামতের দিন নাম ধরেই ডাকা হবে।" (সহিহ মুসলিম, ২১৩২)

➤ **একটি সুন্দর নাম শিশুর চারিত্রিক বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।**

(৩) আকিকা করা

☑ নবজাতকের পক্ষ থেকে **আকিকা করা সুন্নত** এবং এটি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

☑ **ছেলের জন্য দুইটি ছাগল/ভেড়া, মেয়ের জন্য একটি ছাগল/ভেড়া জবাই করা হয়।**

☑ আকিকার মাধ্যমে:

- **আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।**
- **শিশুকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা হয়।**
- **গরিবদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।**

☑ **হাদিস:**

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ

"প্রত্যেক শিশু তার আকিকার কারণে বন্ধক থাকে, তাই সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে আকিকা করো।" (আবু দাউদ, ২৮৩৮)

➤ **আকিকা শিশুর জন্য বরকতময় জীবন প্রার্থনার মাধ্যম।**

(৪) খতনা করানো

☑ **খতনা (সুন্নতে খাতনা) করা পুরুষদের জন্য সুন্নত।**

☑ এটি **শিশুর পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।**

☑ **রাসূল (সা.) বলেছেন:**

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ :الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ

"পাঁচটি বিষয় ফিতরাতের (স্বাভাবিক সুন্নাহ) অন্তর্ভুক্ত—খতনা, নখ কাটা, গোফ ছাঁটা, বগলের লোম পরিষ্কার করা ও যৌনাঙ্গের লোম পরিষ্কার করা।" (সহিহ মুসলিম, ২৫৭)

➤ **খতনা স্বাস্থ্য ও ধর্মীয় পরিচ্ছন্নতার অন্যতম চিহ্ন।**

(৩)ভ্রুণ ঝরে ও অকাল গর্ভপাতে সন্তান মারা যাওয়ার ফযীলত

(১) নবী কারীম (সা.) বলেন, যে নারী কুমারী অবস্থায় অথবা বাচ্চা প্রসবকালে অথবা প্রসবোত্তর অসুস্থ্জনিত কারণে মারা যায় সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে। (বেহেশতী যেওর ৮: ৪৬২)

(২) নবী করীম (সা.) বলেন, কোন নারীর গর্ভের সন্তান অকালে মারা যায় আর যা এতে ধৈর্যধারণ করে, তাহলে ঐ সন্তান তার মাকে টেনে টেনে
জান্নাতে নিয়ে যাবে। (বেহেশতী যেওর ৮: ৪৬২)

(৩) নবী করীম (সা.) বলে, যে মহিলার ৩টি সন্তান মারা যাবে, আর সে ধৈর্যধারণ করবে, সে জান্নাতে যাবে। এক মহিলা জানতে চাইল, হে আল্লাহর রাসূল! যার দু'টি বাচ্চা মারা যায় তার কী হবে? নবীজী বলেন, সেও এই সওয়াব পাবে।

এক বর্ণনায় আছে, এক সাহাবী একটি সন্তান মারা যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে নবীজী বলেন, তার জন্যও অনেক সওয়াব রয়েছে।

(বেহেশতী যেওর ৮:৪৬২)

(৪) এক বয়ানে নবীজী মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা কি এ খবরে আনন্দিত হবে না যে, তোমরা স্বামী কর্তৃক গর্ভধারণ করলে এবং স্বামী তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে, এতে তোমাদের ঐ পরিমাণ সওয়াব লাভ হয়, যে সওয়াব হয় সারা দিন রোযা রাখলে এবং সারা রাত জেগে ইবাদত করলে।শুধু তাই নয়, নারীর যখন প্রসব বেদনা ওঠে তখন তার অগণিত সওয়াব লাভ হতে থাকে। বাচ্চা জন্মলাভের পর বাচ্চা যখনই মায়ের স্তন চোষে এবং দুধ পান করে, তখন তার প্রতিটি চোষণ এবং ঢোকে একটি করে নেকী লাভ হয়। বাচ্চার কারণে মা রাত জাগলে ৭০টি গোলাম আযাদ করার সওয়াব মা লাভ করে। (কানযুল উম্মাল, বেহেশতী যেওর ৮:৪৬৪)

(৫) একবার নবীজীর দরবারে জনৈকা মহিলা আসে। সাথে তার দু'টি বাচ্চা ছিল। একটি মায়ের কোলে আর অপরটি মায়ের আঙ্গুল ধরে রেখেছিল। নবীজী 'মা-সন্তানের' এ মমতার দৃশ্য দেখে বলেন, মহিলারা কত কষ্ট করে প্রথমে গর্ভে সন্তান ধারণ করে। কষ্ট স্বীকার করে বাচ্চা জন্ম দেয়। বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলে তাকে কেমন অন্তর দিয়ে ভালবাসে। যদি মহিলারা স্বামীর সাথে দুর্ব্যবহার না করে এবং ঠিকমত নামায পড়ে, তবে তারা অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

(বেহেশতী যেওর ৮: ৪৬৪)

(৬) নবী করীম (সা.) বলেন, যদি কোন মহিলা বিধবা হয়ে যায় আর সে যেমনি বংশীও তেমনি ধনী হলেও সন্তান লালন-পালনে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে নিজের রূপ-যৌবনের কথা ভুলে যায় এবং ওদিকে সন্তান বড় হয়ে আলাদা বসবাস করে অথবা মারা যায়, তাহলে এ ধরনের মহিলা জান্নাতে আমার এত কাছে থাকবে, যেমন শাহাদাত আঙ্গুল এবং মধ্যমা আঙ্গুল কাছাকাছি।

এখানে বিধবা বলতে সেই নারী উদ্দেশ্য যে বিবাহের প্রতি মোটেও আগ্রহ রাখে না। সুতরাং কোন নারী বিধবা হলেও যদি বিবাহের প্রতি আগ্রহ রাখে, তাহলে তার বিবাহ করাই উত্তম।

শিশুর মানসিক ও চারিত্রিক গঠন

শিশুর মানসিক ও চারিত্রিক গঠন তার ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি স্থাপন করে। একটি শিশুর নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সামাজিক আচরণ কেমন হবে, তা নির্ভর করে তার পরিবার, পরিবেশ এবং প্রাথমিক শিক্ষার ওপর। ইসলাম শিশুদের শিষ্টাচার, সত্যবাদিতা, ধৈর্য, সহমর্মিতা ও দায়িত্বশীলতা শেখানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, যাতে তারা একজন সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

১. শিষ্টাচার শেখানো
শিশুকে ছোটবেলা থেকেই ভালো ব্যবহার ও শিষ্টাচারের শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারকে সবচেয়ে ভালো ব্যবহার করে।"
(তিরমিজি, ৩৮৯৫)

☑ শিশুকে কীভাবে শিষ্টাচার শেখানো যায়?

- বড়দের সম্মান করা ও ছোটদের স্নেহ করা শেখাতে হবে।
- সুন্দর ও ভদ্র ভাষায় কথা বলা অভ্যাস করাতে হবে।
- অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ও বিনয়ের সাথে আচরণ করতে শেখাতে হবে।
- সালাম দেওয়ার ও উত্তম কথা বলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

২. সত্যবাদিতা ও ন্যায়বিচার শিক্ষা দেওয়া

সত্যবাদিতা ও ন্যায়বিচার হলো শিশুর চারিত্রিক গঠনের অন্যতম মূল ভিত্তি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

"সত্যবাদিতা মানুষকে নেকীর দিকে করে, আর নেকী মানুষকে জান্নাতের দিকে করে।" *(সহিহ বুখারি, ৬০৯৪; সহিহ মুসলিম, ২৬০৭)*

☑ শিশুকে সত্যবাদিতা ও ন্যায়বিচার শেখানোর উপায়:

- শিশু যখন সত্য কথা বলে, তখন তাকে উৎসাহিত করতে হবে।
- কখনোই মিথ্যা বলা উচিত নয় এবং শিশুকে মিথ্যা বলতে নিরুৎসাহিত করতে হবে।
- নিজের ভুল স্বীকার করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
- অন্যায় বা অবিচার করলে তাৎক্ষণিকভাবে বোঝাতে হবে যে এটি ভুল।

৩. ধৈর্য ও সহমর্মিতা শেখানো

ধৈর্য ও সহমর্মিতা শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের গুরুত্বপূর্ণ দিক। একজন ধৈর্যশীল ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তি সমাজে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে এবং সকল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়।

"আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।" *(সূরা আল-ইমরান: ১৪৬)*

☑ শিশুকে ধৈর্য ও সহমর্মিতা শেখানোর উপায়:

- ছোটখাটো সমস্যা বা বিলম্বের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরতে শেখাতে হবে।
- খেলাধুলায় জয়-পরাজয়কে স্বাভাবিকভাবে নিতে শেখাতে হবে।
- গরিব, দুস্থ ও অসহায়দের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে উৎসাহিত করতে হবে।
- অন্যদের সাহায্য করতে শেখাতে হবে, যাতে তারা দায়িত্বশীল ও দয়ালু হয়ে ওঠে।

আমরা কি আমাদের সন্তানদের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের শিক্ষা শুধু মুখে বলে দিচ্ছি, নাকি নিজেরাই তা করে দেখাচ্ছি? শিশুরা আসলে কথা নয়, কাজ দেখে শেখে। আমরা যদি নিজেরাই লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা পূরণে আন্তরিক না হই, মাঝপথে হাল ছেড়ে দিই, তাহলে সন্তানরাও মনে করবে—লক্ষ্য স্থির রাখা জরুরি নয়, ইচ্ছামতো ছেড়ে দেওয়া যায়। একজন মা-বাবা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র উপদেশ দেওয়া নয়, বরং নিজেদের কাজের মাধ্যমে একটি আদর্শ দেখানো। যদি আপনি ঠিক করেন প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত বা মুখস্থ করবেন, ঘর পরিষ্কার রাখবেন বা সময়মতো খাওয়া-দাওয়া করবেন—কিন্তু নিয়মিত না থাকেন, তাহলে সন্তানদের মনেও এই বার্তাই গেঁথে যাবে যে ধারাবাহিকতা

প্রয়োজন নয়। অথচ, সফলতার চাবিকাঠি হলো ‘Consistency’—অর্থাৎ নিয়মিতভাবে অল্প অল্প করে চেষ্টা করা। বাংলায় যেমন বলে, “অল্প অল্প করিয়া যদি শিখে, তাহার বিদ্যা গাঢ় হয়।” প্রতিদিন কেবল ২-৩ আয়াত মুখস্থ করলেও তা নিয়মিত করলে আপনি সফল হবেন, সন্তানও শিখবে ধৈর্য ও মনোযোগ কীভাবে ধরে রাখতে হয়। হঠাৎ একদিন বেশি সময় দিয়ে কাজ করে থেমে যাওয়া নয়, বরং প্রতিদিন ১০-২০ মিনিট করে সন্তানকে সময় দেওয়া, পড়াশোনায় সাহায্য করা—এসব ছোট ছোট কাজই বড় শিক্ষার বীজ বপন করে। সুতরাং, কেবল দুনিয়াবি সাফল্য নয়, বরং সন্তানদের ঈমানদার, নেক বানানোই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আগে আমাদের নিজেদের আচরণে ধারাবাহিকতা আনতে হবে। মুখে ভালো কথা নয়—কাজে করে দেখানোই সফল প্যারেন্টিংয়ের মূল চাবিকাঠি।

৪. দায়িত্বশীলতা ও আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তোলা

একজন দায়িত্বশীল ও আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি জীবনে সফলতার পথে এগিয়ে যেতে পারে। ইসলাম প্রতিটি শিশুকে দায়িত্বশীল হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" *(সহিহ বুখারি, ৮৯৩; সহিহ মুসলিম, ১৮২৯)*

☑ শিশুকে দায়িত্বশীল ও আত্মনির্ভরশীল করতে:

- তাদের ছোট ছোট কাজের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে, যেমন নিজের খেলনা গুছিয়ে রাখা।
- নিজে নিজে খাবার খাওয়া, পোশাক পরা ও ব্যক্তিগত কাজগুলো করতে শেখানো উচিত।
- প্রতিদিনের নির্দিষ্ট কাজের জন্য তাকে উৎসাহিত করা দরকার, যাতে সে দায়িত্ববোধ অর্জন করতে পারে।
- তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করতে হবে, যাতে সে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শেখে।

একটি শিশুর মানসিক ও চারিত্রিক গঠনের জন্য তার পরিবার ও আশপাশের পরিবেশের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। শিশুকে ছোটবেলা থেকেই ভালো আচরণ, সত্যবাদিতা, ধৈর্য,

সহমর্মিতা ও দায়িত্বশীলতার শিক্ষা দিলে সে একজন উত্তম মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ অনুসরণ করে শিশুকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হলে, সে শুধু নিজের জন্য নয়, বরং পুরো সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে।

সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষা ও আত্মিক উন্নয়ন

সন্তানের সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা ও আত্মিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা পিতামাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। একটি শিশুর মানসিক ও চারিত্রিক গঠন যেমন পরিবারের মাধ্যমে হয়, তেমনি তার আত্মিক ও ধর্মীয় ভিত্তিও গড়ে ওঠে ছোটবেলা থেকে পাওয়া শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে। জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মানুষ এর জন্য ফরজ এই হাদিস টি মোটামুটি আমরা সবাই জানি ।কিন্তু এই অর্জন কিন্তু দ্বীনি জ্ঞান অর্জন এর কথা বলা হয়েছে I তাহলে কি আমরা শুধু দ্বীনি জ্ঞান ই অর্জন করবো? না, দীন ও দুনিয়া সমন্বয় করে চলার জন্য আমরা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন এর পর প্রাতিষ্টানিক জ্ঞান অর্জন করবো । একজন মুসলিম হিসাবে আমাদের দায়ীত্ব একজন বাচ্চাকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া ।ছোট বেলা থেকেই তাওহীদ ,আকিদা এর পর ধাপে ধাপে কুরআন,কুরআনের অর্থ বুঝা , সুন্নাহ শিখানো । এর পর দুনিয়াবি জ্ঞান আমরা একটা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যাবো । একজন মুসলিম মা বাবা হিসাবে সকলের উপর ফরজ সন্তান কে সঠিক শিক্ষা দেওয়া ।

ইসলাম শিশুকে একটি পবিত্র আমানত হিসেবে বিবেচনা করে, এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব পিতামাতার ওপর ন্যস্ত করেছে। নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ"

"প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের (শুদ্ধ প্রকৃতি) উপর জন্মগ্রহণ করে। পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে।" (সহিহ মুসলিম, ২৬৫৮)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, একটি শিশুর বিশ্বাস ও আত্মিক গঠনের প্রধান উৎস তার পরিবার। তাই পিতামাতার উচিত ছোটবেলা থেকেই সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিকতার বিকাশ নিশ্চিত করা। নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. তাওহীদ ও আকিদা শিক্ষা দেওয়া

তাওহীদ বা একত্ববাদ ইসলামের মূল ভিত্তি। এটি শিশুর মনে শক্তিশালী ঈমান প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ। সন্তানকে শেখাতে হবে যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং তিনিই সকল শক্তির উৎস। কুরআনে বলা হয়েছে,

"قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ"

"বল, তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ নির্ভরতার একমাত্র কেন্দ্র।" (সূরা আল-ইখলাস: ১-২)

শিশুকে ছোটবেলা থেকেই এই শিক্ষাগুলো দেওয়া উচিত:

- আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং সবকিছু তাঁর ইচ্ছায় ঘটে।
- আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতা রাখতে হবে।
- শিরক (আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করা) সবচেয়ে বড় গুনাহ।

সন্তানের ঈমানকে শক্তিশালী করতে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত, নবীজির শিক্ষাগুলো এবং ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর ব্যাখ্যা তাদের উপযোগী ভাষায় বোঝানো উচিত।

২. কুরআন শিক্ষা দেওয়া

কুরআন হলো মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম দিকনির্দেশনা। পিতামাতার উচিত ছোটবেলা থেকেই সন্তানের কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ"

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।" (সহিহ বুখারি, ৫০২৭)

কুরআন শিক্ষা দিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে:

- শিশুকে ছোটবেলা থেকেই কুরআন তেলাওয়াত শুনতে অভ্যস্ত করা।
- কুরআন তেলাওয়াত শেখানো এবং অর্থ বোঝানোর চেষ্টা করা।
- কুরআনের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার গুরুত্ব বোঝানো।

কুরআনের শিক্ষা শিশুকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে এবং তার আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করবে।

৩. নামাজ ও রোজার গুরুত্ব বোঝানো

ইসলামে নামাজ হলো ইমানের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। নবীজির শিক্ষা অনুযায়ী, শিশুকে সাত বছর বয়স থেকেই নামাজের জন্য অভ্যস্ত করা উচিত। তিনি বলেছেন:

"مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ"

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজের আদেশ দাও।" (আবু দাউদ, ৪৯৫)

নামাজের শিক্ষা দিতে:

- শিশুকে ছোটবেলা থেকেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের গুরুত্ব বোঝানো উচিত।
- পিতামাতা নামাজ আদায় করলে সন্তান তা অনুসরণ করতে আগ্রহী হবে।
- নামাজ পড়ার আনন্দ ও পুরস্কার সম্পর্কে জানানো উচিত।

তেমনি, রোজার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য শিশুকে ধীরে ধীরে রোজার প্রতি অভ্যস্ত করতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে যে, রোজা আমাদের আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হয়।

৪. দোয়া ও ইবাদত শেখানো

দোয়া ও ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম মাধ্যম। শিশুকে ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন দোয়া ও ইবাদত শেখানো উচিত। আল্লাহ বলেন,

"وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ"

"তোমাদের রব বলেছেন, আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।" (সূরা গাফির: ৬০)

শিশুকে দোয়া ও ইবাদতের প্রতি আগ্রহী করতে:

- ঘুমানোর আগে, খাওয়ার আগে ও পরে, বের হওয়ার সময় এবং অন্যান্য অবস্থায় কী দোয়া পড়তে হয়, তা শেখানো উচিত।
- তাকে বোঝানো উচিত যে, আল্লাহ সবসময় আমাদের ডাকে সাড়া দেন।
- ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা ও রহমত পাওয়া যায়।

৫. হালাল-হারাম বোঝানো

শিশুর মধ্যে হালাল ও হারামের পার্থক্য বুঝানোর দায়িত্ব পিতামাতার। ইসলামে যা হালাল, তা গ্রহণ করতে এবং যা হারাম, তা থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"إِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ"

"নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট।" (সহিহ বুখারি, ২০৫১)

শিশুকে শেখাতে হবে:

- হালাল খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব।
- সৎ পথে উপার্জন করা এবং হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকা।

- মিথ্যা, চুরি, প্রতারণার মতো হারাম কাজ থেকে দূরে থাকা।

এই শিক্ষা শিশুকে সৎ, নৈতিক ও পরহেজগার হতে সাহায্য করবে।

সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষা ও আত্মিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা পিতামাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। ইসলামি শিক্ষায় গড়ে ওঠা একটি শিশু ভবিষ্যতে ন্যায়পরায়ণ, সৎ ও আত্মিকভাবে উন্নত একজন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে। কুরআন ও হাদিসের আলোকে, শিশুর মধ্যে তাওহীদ, নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া ও হালাল-হারাম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা অপরিহার্য। এটি শুধু তাদের ব্যক্তিগত জীবন নয়, বরং সমগ্র সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

সন্তানের জাগতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

একজন শিশু পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার জন্য শুধু ধর্মীয় শিক্ষা যথেষ্ট নয়; তাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সে পার্থিব জীবনে সফল হতে পারে এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বজায় রেখে সমাজে অবদান রাখতে পারে। ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি জাগতিক শিক্ষার গুরুত্বও অপরিসীম। এই অধ্যায়ে সন্তানের জাগতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

১. ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার সমন্বয়

সঠিক শিক্ষা হলো ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার সমন্বয়। ইসলাম শুধু ধর্মীয় শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয় না, বরং জাগতিক শিক্ষার প্রতিও সমান গুরুত্ব প্রদান করেছে। নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ"

"প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।" (ইবন মাজাহ, ২২৪)

সন্তানের মধ্যে ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার মধ্যে ভারসাম্য আনতে:

- ছোটবেলা থেকেই ইসলামি জ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।
- বিজ্ঞানের মৌলিক জ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, গাণিতিক দক্ষতা ইত্যাদি শেখানোর পাশাপাশি ইসলামের আদর্শের সঙ্গে সেগুলো সংযুক্ত করতে হবে।
- আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষিত করা, তবে তা যেন নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন না করে।

একজন প্রকৃত মুসলিম হতে হলে শুধু ধর্মীয় জ্ঞানে দক্ষ হওয়া যথেষ্ট নয়; বরং তাকে পার্থিব শিক্ষায়ও পারদর্শী হতে হবে, যাতে সে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

২. নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া

শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কেবল পেশাগত সফলতা নয়; বরং একজন ভালো মানুষ তৈরি করাই মূল লক্ষ্য। ইসলাম সবসময় নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে:

"وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ"

"নিশ্চয়ই তুমি মহৎ চরিত্রের অধিকারী।"

📖 *(সূরা আল-কলম: ৪)*

সন্তানের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গড়ে তুলতে:

- সত্যবাদিতা, সততা ও ইনসাফের শিক্ষা দেওয়া উচিত।
- বিনয়ী ও নম্র হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে এবং অহংকার থেকে দূরে থাকতে হবে।
- সামাজিক দায়িত্ববোধ শেখানো প্রয়োজন, যেমন দান-সদকা, অন্যের প্রতি সহানুভূতি, এবং অন্যের উপকার করা।
- ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা শেখানো, যাতে সে জীবনের প্রতিকূলতা সহজে মোকাবিলা করতে পারে।

একজন নৈতিক ও সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তি পরিবার, সমাজ এবং জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। তাই ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে এই শিক্ষাগুলো দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

৩. কীভাবে সফল মানুষ হওয়া যায়

সফলতা শুধু ধন-সম্পদ অর্জন বা উচ্চপদে চাকরি পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃত সফলতা হলো দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করা। ইসলাম এই ধরনের ভারসাম্যপূর্ণ সফলতার শিক্ষা দিয়েছে। আল্লাহ বলেন:

"وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا"

"আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তার দ্বারা পরকালের কল্যাণ অন্বেষণ কর এবং দুনিয়া থেকেও তোমার অংশ ভুলে যেও না।"

📖 *(সূরা আল-কাসাস: ৭৭)*

একজন সফল মানুষ হতে হলে যা করতে হবে:

- **শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন:** সময়ের সঠিক ব্যবহার, পরিকল্পিত জীবনযাপন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখানো দরকার।
- **কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়:** পরিশ্রম ও ধৈর্যের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন সম্ভব।
- **সততা ও নৈতিকতা বজায় রাখা:** ধোঁকাবাজি, অন্যায়ভাবে লাভ করা বা দুর্নীতির আশ্রয় না নেওয়া।
- **সঠিক পেশা নির্বাচন:** সন্তানকে এমন পেশা ও ক্যারিয়ারের দিকে উৎসাহিত করতে হবে, যা তাকে শুধু ধনী করবে না, বরং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে।
- **আল্লাহর ওপর ভরসা করা:** সব প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের পর আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল রাখা জরুরি।

সন্তানের জাগতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাদের ভবিষ্যৎ গঠনের মূল ভিত্তি। শুধু ধর্মীয় শিক্ষা বা শুধুমাত্র জাগতিক শিক্ষা যথেষ্ট নয়; বরং উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই প্রকৃত শিক্ষা। শিশুকে ছোটবেলা থেকেই নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ ও সফল হওয়ার পথ সম্পর্কে সচেতন করা জরুরি। একজন সত্যিকারের মুসলিম ও সফল মানুষ হয়ে ওঠার জন্য ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার ভারসাম্য রক্ষা করা অপরিহার্য। পিতামাতা যদি এই বিষয়গুলোর প্রতি যত্নশীল হন, তবে তাদের সন্তান ভবিষ্যতে শুধু নিজের জন্য নয়, বরং সমাজ ও উম্মাহর জন্য কল্যাণকর হয়ে উঠবে।

সন্তানের পরদা শেখানো

পরদা বা শালীনতা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যা মুসলিমদের ব্যক্তিগত চরিত্র, সামাজিক জীবন এবং আত্মিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য। এটি শুধুমাত্র বাহ্যিক পোশাক পরিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং লজ্জাশীলতা, সংযম, দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ এবং আত্মসম্মানের প্রতীক। ইসলাম ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যই পরদার নির্দেশনা দিয়েছে, এবং অভিভাবকদের দায়িত্ব হলো ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের মধ্যে শালীনতার গুণাবলি গড়ে তোলা।

১. ইসলামে পরদার গুরুত্ব (কুরআন ও হাদিস)

পরদার বিধান সরাসরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও এটি কঠোরভাবে পালন করতেন ও শিক্ষা দিতেন। কুরআনের নির্দেশনা:

◇ **নারীদের জন্য:**

اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মু'মিন নারীদের বলো, তারা যেন নিজেদের চাদরের একাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে এবং তারা কষ্ট দেওয়া থেকে রক্ষা পাবে। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

📖 *(সূরা আহযাব, ৩৩:৫৯)*

◇ **পুরুষদের জন্য:**

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এতে তাদের জন্য পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সব কর্ম সম্পর্কে অবহিত।"

📖 *(সূরা আন-নূর, ২৪:৩০)*

◇ **নারীদের জন্য দৃষ্টি সংযম:**

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"আর মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে, তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে এবং তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, শুধুমাত্র যা প্রকাশ করা স্বাভাবিক তা ব্যতীত।"

📖 *(সূরা আন-নূর, ২৪:৩১)*

হাদিসের নির্দেশনা:

◊ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—

إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ

"প্রত্যেক ধর্মের একটি বিশেষ গুণ রয়েছে, আর ইসলামের বিশেষ গুণ হলো লজ্জাশীলতা।"

📖 *(ইবন মাজাহ, ৪১৭৫)*

◊ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন—

الحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

"লজ্জাশীলতা শুধু কল্যাণই বয়ে আনে।"

📖 *(সহিহ মুসলিম, ৩৭)*

২. ছোটবেলা থেকে লজ্জাশীলতা শেখানো

শিশুদের ছোটবেলা থেকেই পরদার শিক্ষা দেওয়া জরুরি, যাতে এটি তাদের স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়। কিছু উপায়—

- **শালীন পোশাক পরতে উৎসাহিত করা**
- **বক্তব্য ও আচরণে শালীনতা শেখানো**
- **পরিবারের পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সীমারেখা বজায় রাখা**
- **অপরিচিতদের সামনে নম্রতা ও বিনয়ের সাথে কথা বলা শেখানো**

৩. ছেলে-মেয়ে উভয়ের পরদার শিক্ষা

অনেকেই মনে করেন পরদা শুধু নারীদের জন্য, কিন্তু ইসলাম ছেলে ও মেয়ে উভয়কে পরদার নির্দেশ দিয়েছে।

1. বাচ্চাদের পর্দা শিক্ষা: কখন, কীভাবে ও কতটা?

ছোট ছেলে-মেয়েদের পর্দা বিষয়ক শিক্ষা কবে থেকে, কীভাবে এবং কতটা দেওয়া উচিত?

◊ *এটা কোনো নির্দিষ্ট একটি বই বা ফতোয়ার সারাংশ নয়।* এটি বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক—যেমন: কিছু সম্মানিত আলিমদের আলোচনা, শিক্ষকদের মতামত, islamqa.info এর ফতোয়া, কিছু ইসলামি বই এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সাজানো।

আমরা মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে একটা সাধারণ উদাহরণ দিয়ে শুরু করি—

যারা কখনো সমুদ্র দেখতে গিয়েছেন, নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, সমুদ্রের ধারে একটি নির্দিষ্ট অংশ পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি থাকে এবং তার পরে যেতে নিষেধ করা হয়। সেখানে স্পষ্টভাবে লেখা থাকে:

"এই সীমার বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়"।

কখনো কখনো আবার এমনও দেখা যায়—কোনো সতর্কবার্তা লেখা নেই। হয়তো সেই জায়গাটি সাঁতারের উপযোগী নয়, অথবা ধরে নেওয়া হয় কেউ সেখানে যাবেই না।

তখন আমরা কী করি?

আমরা নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে যেখানে নিরাপদ মনে হয়, শুধু সেখানেই যাই। কেউ সাহস করে একটু বেশি এগোতে পারে, আবার কেউ সতর্কতা অবলম্বন করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে।

◇ এই উদাহরণটি আমাদের শিশুদের **পর্দা শিক্ষা** নিয়েও প্রযোজ্য। ছেলে-মেয়ে—উভয় শিশুর ক্ষেত্রেই **বালেগ হওয়া** পর্যন্ত পর্দার বিষয়ে একেবারে নির্দিষ্ট বয়স বলা কঠিন। কিন্তু তাই বলে কি আমরা কিছুই করব না?

না, বরং এ ক্ষেত্রেও আমাদের করণীয় হলো—সতর্ক থাকা ও ধাপে ধাপে প্রস্তুত করা।

কিছু বাচ্চা একটু আগেই পরিপক্কতা দেখায়, আবার কেউ একটু ধীরে বুঝে। কিছু মা-বাবা তা বুঝে যান, আবার কেউ কেউ বুঝতে না পেরে দেরি করে ফেলেন। তাই সবচেয়ে নিরাপদ হলো—**Safe Side-এ থাকা**।

ইসলামে এমনিতেই যখন কোনো বিষয়ে নিশ্চিত নই, তখন সাবধানতা অবলম্বন করাই উত্তম।

তাই পর্দা শিক্ষা বিষয়েও যদি আপনি বুঝতে না পারেন—"সন্তান কবে থেকে কোনটা শিখবে?"—তবে নিজেই ধীরে ধীরে ধাপগুলো তৈরি করুন।

2. বাচ্চাদের পর্দা শিক্ষা নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করা—তিনটি মূলনীতি ও বয়সভিত্তিক বিবেচনা

প্রথমেই আমরা যে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিব, সেটা হলো—**যখন আমরা নিশ্চিত না যে একটি ছেলে বা মেয়ে বালেগ হয়েছে কিনা, তখন আমাদের উচিত সাবধানতা অবলম্বন করা**।

কারণ ইসলাম আমাদের শেখায়, সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে নিরাপদ পথ বেছে নিতে। বালেগ হওয়া মানে শুধু বয়সে বড় হওয়া না, বরং তখন থেকে তার উপর ইসলামী বিধান পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হয়ে যায়।

◇ **দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো—বাচ্চারা শুধু বালেগ হওয়া পর্যন্তই 'বাচ্চা'।** একবার কেউ বালেগ হয়ে গেলে, সে ছেলে হোক বা মেয়ে—তার উপর *প্রাপ্তবয়স্কদের মতই ইসলামী বিধান পালন করা ফরজ* হয়ে যায়। তখন আর তাকে "প্র্যাকটিস করার সময় দিচ্ছি" বলা যাবে না।

উদাহরণস্বরূপ:

- ৯, ১০, ১১, বা ১২ বছর বয়সে কেউ বালেগ হলে, সেখান থেকেই তাকে **পুরোপুরি হিজাব, পর্দা ও অন্যান্য ইসলামী আদব মেনে চলতে হবে।**

- তখন আর এটা ভাবার সুযোগ নেই যে, "ও তো এখনও ছোট, একটু সময় দেই", না বরং তখন থেকেই বাস্তবভাবে ইসলাম তার জীবনে প্রযোজ্য হবে।

◇ **তৃতীয় পয়েন্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ—যেটা বড়দের জন্য হারাম, সেটা ছোটদের জন্যও হালাল নয়।** উদাহরণস্বরূপ:

যেমন মদ পান করা হারাম—তাই আমরা কখনোই বলি না, "ও ছোট, একটু খেতে দাও।" ঠিক তেমনিভাবে, *যে কাজগুলো ইসলামically নিষিদ্ধ,* যেমন: অশালীন পোশাক পরা, ফ্রি মিক্সিং, ইত্যাদি—সেগুলোও ছোটদের সামনে স্বাভাবিক করে দেখানো উচিত নয়।

হ্যাঁ, হয়তো ছোট বয়সে শিশুর আমল হিসাব করা হয় না, কিন্তু **অভ্যাস গড়ার বয়স কিন্তু তখনই**। তাই *যেসব বিষয় বড় হয়ে ফরজ বা ওয়াজিব হয়ে যাবে,* সেগুলোর প্রশিক্ষণ ছোটবেলা থেকেই শুরু করা জরুরি।

3. বাচ্চাদের বয়সভিত্তিক তিনটি ধাপ:

বাচ্চাদের বয়স ও মানসিক বিকাশ অনুযায়ী আমরা তাদের তিনটি ধাপে ভাগ করে বুঝতে পারি:

১. প্রাথমিক বয়স (প্রায় ০-৬ বছর):

এই বয়সে বাচ্চারা সচেতনভাবে কিছু বুঝে না, নিজের কাজ নিজেরা করতে পারে না। এ সময় খুব বেশি নির্দেশনা না দিলেও, *পজিটিভ পরিবেশে বেড়ে ওঠা* নিশ্চিত করা জরুরি।

২. মধ্যম বয়স (প্রায় ৭ বছর থেকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত):

এই সময়টিই হলো **প্রশিক্ষণের সেরা সময়**।

- বাচ্চারা এখন অনেক কিছু বুঝতে শেখে—কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ।
- নিজের কাজ নিজেরা করতে পারে, যুক্তি বুঝতে শেখে।

এই বয়সেই ধাপে ধাপে **পর্দা, হিজাব, পরিপূর্ণতা, শালীনতা** ইত্যাদি শেখানো ও অভ্যাস করানো সবচেয়ে উপযুক্ত।

৩. বালেগ হওয়ার পর:

এই বয়সে ইসলামিক আইন ও বিধান সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য হয়ে যায়। তখন **প্র্যাকটিস টাইম নয়, বরং বাস্তব আমল করার সময়**।

◇ ***ছেলেমেয়ের শালীনতা শেখানো—'ও তো ছোট' এই ভুল ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা জরুরি***

এই বয়সে, অর্থাৎ সাত-আট-নয় বছর বয়সে আমরা মেয়েদের এবং ছেলেদের পর্দা সংক্রান্ত আচরণ আলাদা করে দেখবো। এখানে প্রথমেই **মেয়েদের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি।**

আমরা যেটা আগে খেয়াল করবো, সেটা হলো—**মেয়েটির বাহ্যিক অবয়ব (physical appearance)।**

যদি দেখা যায় সে এখনও পুরোপুরি বাচ্চার মতো—তার চলাফেরা, কথাবার্তা, শরীরের গঠন সবই এখনো শিশুসুলভ—তাহলে সে *হিজাবের পূর্ণ বিধানে না পড়লেও,* ধাপে ধাপে তাকে হিজাবের চর্চায় অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

যেমন:

- নরমাল পোশাকের ওপর হালকা করে একটা স্কার্ফ দেওয়া,
- বাইরে বের হতে চাইলে বলা, "এখন আর ছেলেদের সামনে যেও না",
- বা অতিথি এলে সাবধান থাকতে শেখানো।

তবে হ্যাঁ, যদি মেয়েটিকে এখনো পুরোপুরি শিশু মনে হয়, তখন কিছুটা ছাড়ও রাখা যায়। যেমন: সে বাবার কাছে যেতে পারবে, কোনো পুরুষ অতিথিকে সালাম দিতে পারবে—এই পর্যায়ে সম্পর্কের ধরণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিবেচনা করতে হয়।

কিন্তু এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভুল আমরা প্রায় সবাই করে থাকি, বিশেষ করে মা-বাবারা। আমরা নিজের সন্তানের বয়সকে মানতে চাই না।

আমরা বলি—"ও তো বাচ্চা", "ও তো কিছুই বোঝে না", "ও এখনো অনেক ছোট।"

☑ এটা আবেগ থেকে আসা কথা, কিন্তু এর ফলে যেটা হয় তা হলো—আমরা নিজের সন্তানকে শেখানোর দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যাই।

আমাদের বুঝতে হবে—আমার সন্তান ছোট হতে পারে, কিন্তু তার উপর *কোন দায়িত্ব-কখন থেকে প্রযোজ্য হবে,* সেটা *আবেগ না, বরং শরিয়তের নিয়মের উপর নির্ভরশীল*।

কিন্তু বাস্তবতা হলো—

আমরা যদি আবেগে পড়ে এই ভুল করি, এর ক্ষতি হবে আমাদের সন্তানেরই।

- সে এমন কিছু দেখে ফেলবে যা তার মানসিকতা বিকৃত করতে পারে।
- তার মধ্যে অস্বাভাবিক কৌতূহল তৈরি হবে।
- ছোটবেলা থেকেই গড়ে উঠবে এমন কিছু অভ্যাস, যা বড় হয়ে সংশোধন করা কঠিন হয়ে যাবে।

তাই, মা হিসেবে, বাবা হিসেবে, অভিভাবক হিসেবে আমাদের আবেগ নয়—বিবেক ও শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোতে হবে।

আমার সন্তানকে "ও তো বাচ্চা" বলে যত বেশি ছাড় দেবো, ভবিষ্যতে ওর জন্য ঠিক ততটাই কঠিন হয়ে পড়বে ইসলামি আদর্শে গড়ে ওঠা।

◇ ***‘ও তো বাচ্চা’—এই কথাটির সীমা কোথায়? হিজাব শিক্ষা ও বাচ্চাদের পরিপক্কতা নিয়ে বাস্তব গাইডলাইন***

শিশুরা বড় হচ্ছে, পৃথিবীও বদলাচ্ছে।

আমরা মা-বাবারা আবেগে পড়ে প্রায়ই একটা কথা বলি—

"ও তো ছোট! ও বুঝবে না।"

কিন্তু প্রশ্ন হলো—এই "ছোট" কথাটার সীমা কতটুকু?

বিশেষ করে **শরীয়াহ্ অনুযায়ী হিজাব, পর্দা ও পরিমিত আচরণ শেখানোর ক্ষেত্রে** আমাদের বাচ্চাকে ঠিক কখন এবং কীভাবে প্রস্তুত করবো?

4. মেয়েদের ক্ষেত্রে: Physical Appearance অনুযায়ী দুই ধাপে বিবেচনা

☑ *প্রথম ধাপ: একেবারে শিশুসুলভ চেহারা ও আচরণ*

যেমন: ৭/৮ বছর বয়স—চেহারা, শরীর, কথা-বার্তা—সবকিছু এখনো খুব শিশুদের মতো। তখন হিজাব *ধীরে ধীরে* শেখানো হবে।

যেমন:

- নরমাল জামার ওপর হালকা স্কার্ফ দেওয়া
- বলা যাবে: "ছেলেদের সামনে না যাও",
- বা অতিথি এলে একটু পর্দা করার অভ্যাস গড়ে তোলা

এই সময়টা হলো **প্র্যাকটিসের সময়।**

যেমনভাবে ৭ বছর থেকে সালাত শেখানো হয়, ঠিক তেমনি হিজাবও শেখানো যায়। তবে এটা ***কঠোর বাধ্যবাধকতা নয়***।

❗ *দ্বিতীয় ধাপ: চেহারায় বড়দের মতো পরিণতি স্পষ্ট*

অনেক সময় দেখা যায়, মাত্র ৮-১০ বছর বয়সেই মেয়েটির চেহারায় পরিণতি এসেছে—চলাফেরা, শারীরিক গঠন দেখে বোঝা যায় সে শিশু নেই।

তখন থেকে:

- আর ছেলেদের সামনে যাওয়া যাবে না,
- হিজাব বাধ্যতামূলক,
- এবং শরীয়াহ অনুযায়ী যথাযথ পর্দা করতে হবে।

💬 যদিও অনেক বড়রাই হিজাব ঠিকমতো করেন না, তবুও আমরা সন্তানদের দিয়ে চেষ্টা করাবো।

তাদের মধ্যে যেটুকু শেখানো সম্ভব, সেটুকু শুরু করলেই বরকত আসবে ইনশাআল্লাহ।

ছেলেদের ক্ষেত্রে: দুই দিক—Physical এবং Mental

◇ **Physical Appearance:**

যদি ছেলেটিকে দেখে বোঝা যায় সে এখনো একদম বাচ্চা,

তাহলে মেয়েদের সামনে বা মেয়েদের সেকশনে থাকলে তেমন সমস্যা নেই।

কিন্তু—

👉 যখন দেখা যাবে তার গড়ন বা চালচলনে পরিণতি এসেছে,

👉 বয়সে হয়তো ৮-৯ কিন্তু দেখতে বড় মনে হচ্ছে,

তখন আর তাকে মেয়েদের মাঝে থাকতে দেওয়া যাবে না।

◇ **Mental Maturity:**

এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ।

ধরুন, এক ছেলে বয়সে ৭/৮ হলেও—

- মেয়েদের শরীরের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারে,
- নজর দিয়ে তাকায়,
- বা কথাবার্তায় বোঝা যায় সে অনেক কিছু জানে।

তখন আর তাকে 'শিশু' ধরে নিয়ে মেয়েদের মধ্যে রাখা যাবে না।

এমনকি সে যদি বাইরের কেউ না হয়ে *নিজের সন্তান* হয়, তাহলেও:

- তার সামনে শরীর দেখানো পোশাক পরা যাবে না,
- তাকেও শেখাতে হবে, ছেলেরা কোথায় থাকে, মেয়েরা কোথায়—এই আলাদা জগত।

এমনকি যদি ছেলেটি বয়সে ছোটও হয়, তার **mental exposure** বেশি হলে, যেমন—

- গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড বুঝে
- অনলাইন বা কার্টুন দেখে আগে থেকেই অনেক কিছু জেনে ফেলে

তখন তাকে *extra careful* হতে হবে।

৯ বছরের পর থেকে

এই বয়সটা আলাদা গুরুত্বের দাবিদার।

অনেকে বলে—"সে তো এখনো বালেগ হয়নি!"

তবে শরীয়াহ্'র দৃষ্টিতে বালেগ হওয়ার লক্ষণ সবসময় বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

🔓 নিরাপদ অবস্থানে থাকতে চাইলে:

- ৯ বছর পূর্ণ হওয়ার পর ছেলেদেরকে আর মেয়েদের সেকশনে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়।
- কারণ এই বয়সে puberty onset হওয়াটা এখন অনেক সাধারণ।

- ৯ বছর বয়সে সাধারণত একটি শিশু অনেক কিছু বুঝতে শুরু করে—এটা আর অবুঝ বয়স নয়।

তাই, আমরা যদি নিশ্চিত না থাকি ছেলেটি বালেগ হয়েছে কিনা,
তাহলেও **সেফ সাইডে** থাকা ভালো—*মেয়েদের মহলে প্রবেশ নিষেধ।*

শিশুদের খেলাধুলা, পর্দা ও পোশাকবোধ—সুশীলতার বীজবপন শৈশবেই

আমরা যখন সন্তান মানুষ করি, তখন কেবল তাদের খাওয়া-পরা, পড়ালেখা বা Manners শেখানোই দায়িত্ব না—তাদের **হায়া, নিরাপত্তা, চারিত্রিক শালীনতা** গড়ে তোলা আমাদের মূল কাজ। আর এই কাজটা শুরু হয় একদম ছোটবেলা থেকেই, প্রতিটি খেলার সময়, প্রতিটি জামা পরানোর মুহূর্তে।

○ ৯ বছরের পর থেকে: ছেলেমেয়ে আলাদা থাকবে

৯ বছর বয়স থেকে ছেলেমেয়ে অবশ্যই আলাদা থাকবে—

- আলাদা খেলবে
- আলাদা বসবে
- আলাদা জগতের অভ্যস্ত হবে

এই বয়সে তারা অনেক কিছু বুঝতে শেখে—even যদি তারা না চায়, শরীরের ভেতর বিয়োগ-যোগ শুরু হয়।
তাদের innocent থাকাটা তখন আর স্বাভাবিক থাকে না—তাই আলাদা করাটাই নিরাপদ।

○ ৫–৮ বছরের বাচ্চারা খেলছে? অবশ্যই বড়দের নজরদারিতে!

এ বয়সী ছেলেমেয়েরা একসাথে খেলতে পারে, তবে **unattended না**।

☑ বাবা-মা বা বড় কেউ পাশে থাকবেন
☑ কে কেমন খেলছে—দেখবেন
☑ খেলার ধরন কি শরীরকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে কিনা—খেয়াল রাখবেন

যেমন:

- একজন আরেকজনের গায়ে লাফিয়ে পড়ছে
- কেউ কারো উপরে উঠে যাচ্ছে
- শরীরে হাত দিয়ে ঝগড়া করছে বা চিপাচ্ছে

এ ধরনের পরিস্থিতি হলে—

👉 তড়িৎ সরিয়ে দেবেন

👉 ভয় না দেখিয়ে স্মার্টলি বলে দেবেন—"এইভাবে খেলা যাবে না"

👉 পরে বা আগে বুঝিয়ে দিবেন, **কেন এসব ঠিক নয়**

এখানে হাইপার হওয়ার দরকার নেই, কিন্তু *নীরব থেকেও কাজ চলবে না।*

আদব শেখাতে হলে ব্যালান্স দরকার।

এমনকি নিজের সন্তানদের মাঝেও একটা সীমা থাকতে হবে

অনেক মা-বাবা বলেন, "ওরা তো ভাই-বোন!"

ঠিক আছে, ওরা ভাই-বোন, কিন্তু ওরাই তো একদিন বড় হবে।

তাই:

- গায়ে পড়ে খেলা
- খুব বেশি টাচ-ভিত্তিক খেলা
- শরীর টানাটানি—এসব থেকে ধীরে ধীরে দূরে রাখতে হবে
- যদি এক ভাইবোন বড় হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের game বা interaction যেন শালীন থাকে

মনে রাখবেন—**সতর্কতা কেবল বাইরের মানুষের জন্য না**, নিজের ঘর থেকেই চরিত্র গড়ে ওঠে।

5. খেলাধুলা নিয়ে সন্দেহ হলে—আলাদা করাই উত্তম

যখনই মনে হবে:

- "এই দুই বাচ্চাকে কি এখনো একসাথে খেলতে দেওয়া ঠিক?"
- "না জানি কিছু বুঝে না বুঝে করে ফেললো কিনা?"

তখন আর দেরি করবেন না—**আলাদা করে দিন**।

এই আলাদা করাটাই ভবিষ্যতের character guard।

"তোমার ছেলে আমার মেয়ের সাথে খেলতে পারে না"—এটা বলা কঠিন, লজ্জাজনক মনে হতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন,

আমরা আমাদের সন্তানকে আলাদা রেখেছি, কারণ **তাদের চরিত্র ও নিরাপত্তা আমাদের কাছে অগ্রাধিকার।**

6. ছোট মেয়েদের পোশাক—শালীনতা, আরাম ও হায়া শেখানোর শুরু

- **infant–৩ বছর:**
  - শরীর খুব ছোট, তাই পুরো আবৃত রাখাটা একদিকে চ্যালেঞ্জ, আরেকদিকে নিরাপত্তার ব্যাপার
  - হাতাকাটা জামা পরাতে হলে ম্যাগি হাতা বা ভদ্র ডিজাইনের
  - ছোট প্যান্টের বদলে থ্রি-কোয়ার্টার
  - শরীর পুরো ঢাকা না হলেও, **ভদ্রতা বজায় থাকবে**

❌ সিরিয়াল-স্টাইল ছোট কাপড়,

❌ শরীর চেপে বসা জামা

❌ নাভি, কাঁধ বা উরু স্পষ্ট এমন পোশাক—এসব একদম না

- **৪–৬ বছর:**
  - হাঁটুর নিচে প্যান্ট বা ঢিলা পায়জামা
  - হালকা লম্বা জামা বা ফ্রক
  - হাতা যেন শরীর চেপে না বসে
  - গরমে আরামদায়ক হলেও শালীনতা থাকবে

পোশাক হবে এমন:

- যেন বাতাস ঢুকতে পারে
- আবারও শরীরের প্রতিটি আকার যেন দেখা না যায়

০ ৭ বছরের পর থেকে পোশাক আরও পরিপূর্ণ হবে:

- [x] ফুল প্যান্ট বা ঢিলা পায়জামা
- [x] হাফ হাতা পরলে ঢিলেঢালা, না হলে থ্রি কোয়ার্টার/লম্বা হাতা
- [x] ছোট কামিজ হলে পায়জামা আলগা হবে
- [x] ফ্রক যদি পা পর্যন্ত না হয়, তাহলে টাইটস একদম না

বাইরে গেলে হিজাব পরানো শুরু করুন:

- মাথায় ওড়না
- যদি সম্ভব হয়, ছোটদের জন্য হালকা গাউনের মতো আবায়া
- না পারলে ওড়না সহ সুন্দর লম্বা জামা

বাচ্চাদেরকে পরিবেশ দিলে ওরাই শিখবে—*আবায়া পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে: "মা, আমি কেমন লাগছি?"*

7. সন্তানের শালীনতা ও নিরাপত্তার শিক্ষা: মায়ের মমতায় গড়া প্রতিটি পদক্ষেপ

আমরা মায়েরা যখন নিজেদের ছোট ছোট সন্তানদের দিকে তাকাই, তখন তাদের নিষ্পাপ মুখে আমরা ভবিষ্যতের ছায়া দেখতে পাই। তারা একদিন বড় হবে, তাদের চারপাশের জগৎটা জটিল হবে, আর আমরা চাই তারা যেন সেই জটিলতায় নিরাপদ থাকে—শারীরিক, মানসিক, আত্মিক—সবদিক থেকেই। এ জন্য আমাদের মায়েদের একটু একটু করে, ধীরে ধীরে, অনেকটাই স্নেহ আর ভালোবাসার সাথে তাদের পথ দেখাতে হয়।

8. খেলার সময় ও পারস্পরিক যোগাযোগে সংবেদনশীলতা:

৯ বছরের পর ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলা আলাদা করাটাই উত্তম। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, আমরা ওদের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দেব বা অকারণে কড়া হয়ে উঠব। বরং, আমরা যেন নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খেলার অভ্যাস গড়ে তুলি।

৫ থেকে ৮ বছর বয়সের বাচ্চারা যখন একসাথে খেলে, তখন আমাদের আশেপাশেই থাকা উচিত। কারণ এ বয়সে ওরা সব কিছু বুঝে ফেলে না। কখনো কখনো না বুঝে এমন কিছু করতে পারে যা তাদের কোমল মনকে প্রভাবিত করে বা অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটায়। তাই ভাই-বোনের মধ্যেও যদি খেলা অতিরিক্ত টাচ বা ঘনিষ্ঠতাপূর্ণ হয়, তাহলে মায়েরা হালকা হাতে, কিন্তু সচেতনভাবে সেটা থামিয়ে দিতে পারেন।

"না বুবু, এমন করে খেলা যাবে না, চলো অন্য খেলা খেলি"—এভাবে আলাদাভাবে নতুন কোনো খেলায় মনোযোগ সরিয়ে দেওয়া যায়।

এই বিষয়ে অতিরিক্ত ভয় পেয়ে হাইপার হওয়ার দরকার নেই। শুধু স্মার্টলি সরিয়ে দেওয়া ও পরে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দেওয়া—এইটুকুই যথেষ্ট।

9. পোশাক নির্বাচন: শিশুকাল থেকেই শালীনতা ও হায়ার চর্চা

শিশুদের পোশাক—এটি কেবল একটি কাপড়ের প্রশ্ন না, এটি একটি অভ্যাস, একটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। ছোট্ট একটি মেয়ে, হয়তো দুই-তিন বছরের, গরমে হাতা কাটা জামা পরে আছে—এই জায়গাতেও আমরা যেন একটু সচেতন হই। হাতা কাটা হলে ম্যাগি হাতা বা ঢিলেঢালা পোশাক হোক, যেন সেটা দেখতে শালীন ও আরামদায়ক হয়।

১ থেকে ৫ বছর বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে ছোট প্যান্টের বদলে থ্রি কোয়াটার বা হাঁটুর নিচে পোশাক হোক। উপরে যেন এমন কিছু না হয় যা অশালীন দেখায়, এমনকি ছোটবেলাতেই। আমরা যদি ভাবি, "এ তো ছোট, কিছু হবে না"—তাহলে সেটা এক ধরনের অবহেলা।

৬-৭ বছর বয়সে যখন মেয়েরা একটু একটু বুঝতে শুরু করে, তখন তাদের পোশাকে একটা শালীনতা ও শৈলীতার বার্তা থাকা জরুরি। ফ্রক যদি পা পর্যন্ত না হয়, তাহলে টাইটস না দিয়ে ঢিলেঢালা পায়জামা দিন। টপস যদি একটু ছোট হয়, তাহলে প্যান্ট যেন ঢিলা হয়। এই অভ্যাস গড়ার মাধ্যমেই বাচ্চারা বড় হয়ে নিজে থেকে বুঝবে কোনটা তাদের জন্য সম্মানজনক।

10. হিজাব ও ব্যক্তিগত স্পেসের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তোলা

৭ বছরের পর থেকে হিজাব বা মাথা ঢাকার অভ্যাস শেখানো যেতেই পারে, কিন্তু সেটা যেন কখনোই কঠিন বা গloomy অভিজ্ঞতা না হয়। অনেক সময় আমরা দেখি, পর্দার অভ্যাস মানেই যেন সব আনন্দ মাটি—না সাজা, না ঘুরা, না রঙিন জামা। এটা ঠিক না। বরং শিশুদের শেখানো উচিত, আল্লাহ যেটুকু অনুমতি দিয়েছেন সেটুকু পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায়। মেয়েদের সামনে গেলে তারা সেজে যেতে পারে, মায়ের দেওয়া হালকা গয়না পরতে পারে, একটু লিপ গ্লস দিতে পারে। হ্যাঁ, সেটা শুধুই মেয়েদের মাঝে হোক, মাহরামদের মাঝেই হোক, কিন্তু আনন্দটা যেন জীবনের স্বাভাবিক অংশ হয়।

11. আল্লাহর সীমারেখার গুরুত্ব শেখানো

সন্তান যখন হিজাব করতে চায় না বা প্রশ্ন করে কেন করতে হবে, তখন তর্ক নয়—বরং তাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে:

"যাদের সামনে তুমি পর্দা করবে, তারা কি তোমার সৌন্দর্য দেখার অধিকার রাখে? না রাখে, তাই তো? তাহলে তাদের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করার দরকার কী?"

এই প্রশ্ন অনেক গভীর। যদি আপনার সন্তান ছোট থেকেই হিজাব, হায়া, ভদ্রতা—এসব পরিবেশে বড় হয়, তাহলে সে সহজেই বুঝবে হিজাব মানে তার স্বাধীনতা, তার ইজ্জত, তার নিরাপত্তা।

12. মাহরামদের সামনে আচরণে ভারসাম্য রাখা

মাহরামদের সামনে হিজাব জরুরি না হলেও ভদ্রতা ও শালীনতা জরুরি। টাইটস, ট্যাংক টপ—এগুলো একদমই নয়, বিশেষ করে যখন শিশুটি বয়ঃসন্ধিকালের কাছে চলে আসে। এই সময়টাতে শরীরের আকৃতি পরিবর্তিত হয়, আর তখন পোশাকে সতর্কতা থাকা অত্যন্ত জরুরি।

আরামদায়ক হলেও যেন পোশাক ভদ্র হয়। সেজন্য ঢিলেঢালা প্লাজো, লম্বা গেঞ্জি, ফুল হাতা জামা ইত্যাদি বেছে নেওয়া ভালো।

সঠিক পরিবেশ গড়ে তোলা: ঘর থেকে শুরু করে স্কুল পর্যন্ত

শুধু ঘরের মধ্যেই নয়, স্কুলের পরিবেশও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যতই ঘরে শেখান, যদি স্কুলে বা বন্ধুবান্ধবের মাঝে অশালীন পোশাকের চর্চা চলে, তাহলে আপনার শিক্ষা টিকে থাকা কঠিন হয়ে যায়। তাই সন্তানের স্কুল, বন্ধু নির্বাচন—সব জায়গায় কিছুটা ভূমিকা রাখতে হবে। আমাদের দায়িত্ব সন্তানদের জীবন থেকে আনন্দ কেটে নেওয়া নয়, বরং এমনভাবে শেখানো যে, তারা জানে কীভাবে আল্লাহর সীমার মধ্যে থেকে সুন্দরভাবে বাঁচতে হয়। তারা জানবে, দুনিয়ার সব সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়—যদি সেটা হালাল ও সীমার মধ্যে হয়।

13. বাচ্চাদের পোশাক, পর্দা ও পরিচ্ছদ: একটা ভালোবাসাময় গাইডলাইন

১. মেয়েদের বিষয়টি আগে দেখি...

প্রথমেই একটা কথা—আমরা যখন আমাদের মেয়েশিশুদের পর্দা শেখাতে চাই, তখন আমাদের একটু *creative* হতে হবে। যাতে তারা একদিকে পর্দা শিখতে পারে, অন্যদিকে সেটা আনন্দের সঙ্গেও উপভোগ করতে পারে। আমরা এমন একটা পরিবেশ গড়ে তুলব ইনশাআল্লাহ, যেখানে হায়া এবং স্বাধীনতা একসাথে হাত ধরে চলে।

ধরুন, কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে, পরিবার বা মহিলা গেদারিং—সেখানে সে একটু সাজলো, চুড়ি পরলো, ড্রেসটা একটু রঙিন পরলো—*এই জিনিসগুলো থেকে তাকে বঞ্চিত করবেন না।* বরং এটাকেই আপনি তাকে শেখান: "তুমি তো সাজতেই পারো! কিন্তু কাদের সামনে সাজা যায় আর কাদের সামনে না, সেটা বুঝে নিতে হবে।"

অনেকে ভুল করে এমন পরিবেশ বানিয়ে ফেলেন, যেখানে পর্দার নামে বাচ্চাদের মধ্যে একধরনের গ্লানি ঢুকে যায়—যেন আনন্দ করতে নেই, সাজতে নেই, হাসতেও নেই। অথচ, ইসলাম তো সে কথা বলে না! ইসলাম বলে—*আনন্দ করো, কিন্তু সীমা রেখে।*

আল্লাহ যা হালাল করেছেন সেটা উপভোগ করো—আর যা হারাম করেছেন সেখানেই থেমে যাও।

এই কথাটাই আমাদের মেয়েদের শিখাতে হবে। হিজাব মানে দুঃখ, পর্দা মানে কষ্ট—এই ভুল ধারণাগুলো দূর করা আমাদেরই দায়িত্ব।

আমার মেয়েকে আমি নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছি, চুড়ি পরিয়েছি, মুখে হালকা বেবি লিপস্টিক দিয়েছি—but আমি তাকে শিখিয়েছি:

"তুমি এটা তোমার বান্ধবীদের সামনে করতে পারো, নানু-খালা-মামিদের সামনে করতে পারো, কিন্তু যাদের সামনে পর্দা করতে হবে, তাদের সামনে নয়। কারণ ওদের চেহারা দেখার অধিকার নেই, আর যাদের নেই, তাদের সামনে চেহারা দেখানোর কী দরকার?"

এই শিক্ষা ওদের ছোট থেকেই দিতে হয়।

বাচ্চা যখন ছোট, তখন সে শিখবে—*আমি পরিপাটি হবো, কিন্তু ভদ্রতা বজায় রেখে। আমি সাজবো, কিন্তু সীমানা বুঝে। আমি আনন্দ করবো, কিন্তু আল্লাহর দেওয়া গাইডলাইন মেনেই।*

২. পোশাক ও স্কুলের পরিবেশ—দুটোই জরুরি

অনেক সময় দেখা যায়, বাড়িতে আমরা একটা নিয়ম চালু করেছি, কিন্তু স্কুলে গিয়ে সে পুরো উল্টো পরিবেশের মুখোমুখি হচ্ছে। বান্ধবীরা সবাই যখন কার্টুন প্রিন্টের টাইট ফ্রক পরছে, ফ্রোজেন, বার্বি, বা সুপারহিরোদের ওয়েস্টার্ন পোশাক পরছে, তখন সেই মেয়েটার মনে তৈরি হয় আগ্রহ—আর এটা খুব স্বাভাবিক।

তাই আমরা যদি সত্যিই চাই আমাদের সন্তান নিজের মতো থেকে আল্লাহর পথে চলুক, তবে আমাদের এমন স্কুল বেছে নিতে হবে, যেখানে এই ধরনের প্রভাব কম। স্কুলের বন্ধুমহল, শেখার পদ্ধতি—সব যেন ইসলামী মূল্যবোধের অনুকূলে থাকে।

পোশাক পরার ক্ষেত্রে—**"যা ইচ্ছা তাই" নয়**, বরং *"যা ইচ্ছা, তার মধ্যে গাইডলাইন অনুযায়ী"।*

বাবা ও ভাইয়ের সামনে যা পরা যায়, সেরকম modest পোশাকেই অভ্যস্ত হতে হবে।

ছেলেদের ক্ষেত্রেও একই রকম সিরিয়াস হওয়া দরকার, বরং অনেকক্ষেত্রে আরও বেশি। কেননা ছেলেরা যত বড় হয়, ততই বাইরে যেতে হয়, সমাজে মেশে, তাদের পরিবেশে প্রভাব পড়ে আরও বেশি।

সাধারণত আমরা মেয়েদের পোশাক নিয়ে বেশি আলোচনা করি, কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রেও সমস্যা কম নয়। যেমন, টাইট প্যান্ট, ফিটিংস জামা—এসব শরীরের অঙ্গ স্পষ্ট করে ফেলে, যা শরীয়ত সম্মত নয়। তাই ছোটবেলা থেকেই ছেলেদের এমন জামা-কাপড়ে অভ্যস্ত করাতে হবে, যা ঢিলা ও টাখনুর উপর।

টাখনুর নিচে কাপড় পরা—ছোট মনে হলেও এটা একটা বড় sunnah এবং আদবের বিষয়। আপনি নিজে প্রতিদিন কাপড়টা একটু ভাঁজ করে দিবেন, এমনভাবে যে বাচ্চা বুঝে যাবে— *"এটাই স্বাভাবিক, এটাই আমার কমফোর্ট।"*

হাফপ্যান্ট খুব দরকার—এটা আসলে আমাদের বানানো ধারণা। হাঁটুর উপরে বা হাঁটুর নিচে কাপড়ে তেমন পার্থক্য নেই গরমের দিক থেকে। বরং হাঁটুর নিচে loose cotton প্যান্ট হলে সেটা শরীরের জন্যও ভাল এবং পর্দার দিক থেকেও safe।

৩. কোট-টাই না, থোব আর পাঞ্জাবি হোক স্মার্টনেসের সংজ্ঞা

আজকাল আমরা ছেলেদের একটু ফ্যান্সি দেখাতে গেলে কোট-টাই-স্যুট পরিয়ে দেই—এই ধারণাটা পরিবর্তন করতে হবে। কোট-টাই, ওয়েস্টার্ন স্যুট—এসব ইসলামী পোশাক নয়। ছেলেরা এসব পড়লে কেউ স্মার্ট হয় না, বরং নিজের ধর্মীয় আইডেন্টিটি থেকে দূরে সরে যায়।

স্মার্ট মানে কি? সুন্দর মানে কি? *যা আল্লাহর সামনে প্রিয়, তাই-ই তো সত্যিকারের সৌন্দর্য।* তাই আমাদের উচিত—ছোটবেলা থেকেই ছেলেদেরকে পাঞ্জাবি, থোব, ঢিলা জামা-প্যান্টে অভ্যস্ত করা, যেখানে modesty ও ইসলামী পরিচয় দুটোই থাকে।

এমন মানুষদের সাথে ছেলেদের মিশতে দিন, যারা ইসলামী পোশাকে সম্মান করে। এমন মহলে রাখুন যেখানে কোট-টাই না পরলে "অস্মার্ট" বলা হয় না, বরং ইসলামী পোশাককে "মান সম্মত" বলা হয়।

সন্তানকে আল্লাহর পথে বড় করতে চাইলে, *environment* এবং *training*—দুটোই লাগবে। একদিকে আমরা তাকে guideline দেব, অন্যদিকে এমন সমাজে রাখবো যেখানে সে তার আদর্শকে ভালোবাসতে শিখবে।

আর এই পথ একদিনে হবে না। ধৈর্য, দোআ, আর চেষ্টা—এই তিনটিই আমাদের হাতিয়ার। শিশুদের পর্দা শেখানো—এটা কেবল একটা নিয়ম মানার বিষয় না, এটা একটা মানসিক প্রস্তুতি, একটা দৃষ্টিভঙ্গি, একটা জীবনব্যবস্থা। আমরা যেভাবে তাদের হাতে কলম ধরাই, হরফ শেখাই, দাঁড়াতে শিখাই—ঠিক সেভাবেই তাদের চোখ নামিয়ে রাখার আদবও শেখাতে হবে। এটা ছেলে-মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, বরং ছেলেদের জন্য অনেকাংশে বেশি জরুরি।

ছেলেরা কীভাবে শেখে?

Puberty (বাল্যসন্ধি) যখন এসে যায়, তখন গিয়ে হঠাৎ বলি: "চোখ নামাও", "টাখনুর উপর কাপড় পরো", "হিজাব করো"—এসব তখন বলা খুব কঠিন হয়ে যায়। অভ্যাস যদি তৈরি না হয়, তাহলে হৃদয়ে এই নির্দেশগুলোর ওজন পড়ে না। তাই আমাদেরকে শুরুটা

করতে হবে একদম ছোটবেলা থেকে। এমনকি শিশুর জন্মের পর থেকেই যেন মনে রাখি—এই সন্তানটা যেন আল্লাহর একজন বান্দা হয়ে বড় হয়, যেন তার জন্য ইসলামের বিধানগুলো নতুন কিছু না হয়, বরং আপন হয়ে ওঠে।

আমরা হঠাৎ করে বদলেছি—তাই জানি কতোটা কষ্ট

আমরা অনেকেই হয়তো হঠাৎ করে ইসলাম শিখেছি, কোনো এক সন্ধ্যায় চোখে পানি নিয়ে তাওবা করে পথ বদলেছি। আলহামদুলিল্লাহ, এটা আল্লাহর অশেষ দয়া। কিন্তু সেই পরিবর্তনের পথ যে কতটা কঠিন, তা আমরা জানি। জন্মদিনে কেক না বানানোর সিদ্ধান্ত, পুরোনো গান ছেড়ে দেওয়া, পোশাক বদলানো—এগুলো আমাদের জন্য কতটা চ্যালেঞ্জ ছিলো!

তাহলে আমাদের সন্তানের ক্ষেত্রে কেন আমরা আগে থেকেই সেই পথটা সহজ করে দেই না?

একজন মা হিসেবে, একজন বাবা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব

শিশু জন্মানো মানে কেবল নতুন মুখ দেখা না—এর মানে হলো, এক নতুন মুসলিমকে গড়ে তোলা, এক নতুন উম্মতকে তৈরি করা। তাই আমাদের চিন্তা করতে হবে, এই শিশুটি যেন ইসলামের আলোয় বড় হয়, যেন কালকে দাঁড়িয়ে ধর্ম পালন করা তার জন্য কঠিন না হয়।

কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়া—কিন্তু সীমারেখা বজায় রেখে

আমি একবার আমার উস্তাদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ছোট ছেলেরা মেয়েদের কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পারবে কি?" তিনি বলেছিলেন, কুরআনের শব্দ হৃদয়কে নরম করে দেয়, তা মন ছুঁয়ে যায়। তখন থেকেই বুঝি, এটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করা জরুরি। ভয়েস আওরাহ কি না, সেই তর্কে যাবার দরকার নেই। বিষয়টা হলো—ছেলেরা যাতে অপ্রয়োজনে মেয়েদের আওয়াজ শুনে soft corner বা অতিরিক্ত আগ্রহ তৈরি না করে। কারণ বাস্তবতা হলো—আজকাল আট-নয় বছরের ছেলেদেরও crush হয়ে যায় তাদের টিচারদের উপর। আমরা মুখে না বললেও, তারা বাস্তবে শিখে ফেলে অনেক কিছু। তাই আমাদের আগে থেকেই সচেতন হতে হবে।

পরিবেশ matters — বাচ্চারা যা দেখে, তাই শেখে

পরিবেশ—এই একটি শব্দের মধ্যে সবকিছু লুকিয়ে আছে। বাচ্চারা যদি এমন জায়গায় বড় হয়, যেখানে পর্দা, শালীনতা, দ্বীন নিয়ে কেউ হাসাহাসি করে না, যেখানে ইসলাম পালন করা cool, সেখানে বড় হওয়া বাচ্চাদের দ্বীন মানা সহজ হয়।

আমাদের নিজেদের যেমন পরিবেশ দরকার হয় ভালো থাকতে, তেমনি বাচ্চাদেরও দরকার হয় এমন একটা পরিবেশ, যেখানে তারা ইসলামকে ভালোবাসতে পারে, ভালোভাবে শিখতে

পারে।

এই আলোচনার উদ্দেশ্য কাউকে ভীত করা নয়, বরং জাগিয়ে তোলা। আমাদের সন্তানরা আমাদের আমানত। তারা যেন দ্বীন ধরে রাখতে পারে, ইসলামকে ভালোবাসে, পর্দাকে গর্ব মনে করে—এটা চাইলে আমাদের এখনই শুরু করতে হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা যেন আমাদেরকে তাওফিক দেন—উপকারী জ্ঞান অর্জন করার, তা জীবনে প্রয়োগ করার, এবং আমাদের সন্তানদের হেফাজত করার।

এই কাজ হালকাভাবে নেওয়ার না—এইটা আমাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ।

৪. আধুনিক সমাজে পরদার চ্যালেঞ্জ

আজকের যুগে পরদা পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে—

- পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব
- সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাপ
- মিডিয়া ও বিনোদনের মাধ্যমে অশালীনতার প্রসার
- কর্মজীবনের পরিবেশ

এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অভিভাবকদের উচিত—

- সন্তানদের ইসলামের সৌন্দর্য বোঝানো
- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা
- পর্দার উপকারিতা ব্যাখ্যা করা

৫. প্রযুক্তির যুগে পরদার প্রয়োগ

ডিজিটাল যুগে পরদার গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ—

- সোশ্যাল মিডিয়ায় অশালীন কনটেন্ট সহজলভ্য
- ছেলে-মেয়ে উভয়ের মাঝে অবাধ মিশ্রণ সহজতর হয়েছে
- ইন্টারনেটে ভুল শিক্ষা পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে

করণীয়:

☑ **সোশ্যাল মিডিয়ায় শালীনতা বজায় রাখা**

☑ **অপ্রয়োজনীয় চ্যাট ও ভিডিও কলে সতর্ক থাকা**

☑ **ইসলামী কনটেন্ট ও জ্ঞানের উৎস গ্রহণ করা**

পরদা শুধুমাত্র বাহ্যিক পোশাক নয়, এটি আত্মসংযম, লজ্জাশীলতা ও নৈতিকতার পরিচায়ক। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যই পরদা পালন জরুরি। আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জের মধ্যেও পিতামাতার উচিত সন্তানদের ইসলামী পর্দার শিক্ষা দেওয়া, যাতে তারা আত্মিক, সামাজিক ও নৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে গড়ে ওঠে। পরদার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের শুদ্ধতা বজায় থাকে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব হয়।

اللهم اجعلنا من الذين يحفظون أبصارهم وألسنتهم، ويرعون حجابهم، ويبتغون رضاك في كل حال. آمين.

"হে আল্লাহ! আমাদের দৃষ্টি, জিহ্বা ও পোশাক সংরক্ষণকারী বানিয়ে দাও এবং সর্বাবস্থায় তোমার সন্তুষ্টি কামনা করার তাওফিক দান কর। আমীন।"

সন্তানের প্রতি অর্থনৈতিক দায়িত্ব

একজন পিতামাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো সন্তানের জন্য হালাল জীবিকা উপার্জন করা এবং তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা। ইসলাম অর্থনৈতিক দিক থেকে বাবা-মাকে সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে এবং সন্তানের সঠিক লালন-পালন ও উত্তরাধিকারের সঠিক বণ্টন নিশ্চিত করতে বলেছে। এই অধ্যায়ে আমরা সন্তানের অর্থনৈতিক অধিকার ও পিতামাতার দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

১. হালাল জীবিকা নিশ্চিত করা

ইসলামে পিতামাতার দায়িত্ব হলো হালাল উপায়ে উপার্জন করা এবং সন্তানদের জন্য পবিত্র রিজিকের ব্যবস্থা করা। হালাল জীবিকা শুধু উপার্জনের মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সম্পদের প্রকৃতি ও ব্যবহারের দিকেও প্রযোজ্য।

- **কুরআনের নির্দেশনা:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُون

"হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য যে পবিত্র জীবিকা আমি দিয়েছি, তা খাও এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করো।"

📖 *(সূরা আল-বাকারা, ২:১৭২)*

- **হাদিসের নির্দেশনা:**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"হালাল রিজিক অনুসন্ধান করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক।"

📖 *(ইবন মাজাহ, ২১৪৪)*

হালাল জীবিকা নিশ্চিত করতে:

☑ সুদ, ঘুষ, প্রতারণা ও অন্যায় ব্যবসা থেকে বিরত থাকা

☑ অন্যের অধিকার হরণ না করা
☑ সৎ উপায়ে আয় করা

২. সন্তানদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা

সন্তানের জন্য খাবার, পোশাক, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা নিশ্চিত করা পিতামাতার দায়িত্ব। তারা যেন অর্থনৈতিক কষ্টে না পড়ে এবং সঠিকভাবে বেড়ে ওঠে, তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

◇ **কুরআনের নির্দেশনা:**

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমরা তাদেরও রিজিক দিই এবং তোমাদেরও। নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা মহাপাপ।"

📖 *(সূরা আল-ইসরা, ১৭:৩১)*

◇ **হাদিসের নির্দেশনা:**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—

"তুমি যদি তোমার পরিবারের উপর ব্যয় করো, এবং এর মাধ্যমে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি চাও, তবে তা তোমার জন্য সাদাকা হবে।"

📖 *(সহিহ বুখারি, ৫৩৫১)*

সন্তানের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য করণীয়:

☑ পরিমিত ব্যয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা
☑ অপচয় ও অপব্যয় থেকে বিরত থাকা
☑ সন্তানদের স্বনির্ভরতা শেখানো

৩. উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির সঠিক বণ্টন শেখানো

ইসলাম উত্তরাধিকার বণ্টনের সুনির্দিষ্ট নিয়ম দিয়েছে, যাতে প্রতিটি ব্যক্তি তার প্রাপ্য অংশ পায়। পিতামাতার উচিত সন্তানদের উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং অন্যায়ভাবে কারও অধিকার হরণ না করা।

◇ **কুরআনের নির্দেশনা:**

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন: পুরুষের অংশ দুটি নারীর অংশের সমান।"

📖 *(সূরা আন-নিসা, ৪:১১)*

◇ **হাদিসের নির্দেশনা:**

"যে ব্যক্তি উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে অন্যায় করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিনে তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।"

🕮 *(সহিহ মুসলিম, ১৬১৫)*

উত্তরাধিকার সঠিকভাবে বণ্টন করার জন্য করণীয়:

☑ সন্তানদের ইসলামী উত্তরাধিকার আইন শেখানো

☑ মৃত্যুর আগে সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন করা

☑ সম্পদ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা

একজন অভিভাবক শুধু সন্তানদের শারীরিক ও মানসিক যত্ন নিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না, বরং তাদের অর্থনৈতিক অধিকারও সঠিকভাবে নিশ্চিত করতে হয়। হালাল জীবিকা উপার্জন, মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং উত্তরাধিকার সঠিকভাবে বণ্টন করা প্রত্যেক মুসলিম অভিভাবকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এসব বিষয়ে সচেতনতা ও ইসলামী বিধান মেনে চললে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যায়বিচার ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হবে।

.اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه، ووفقنا لتربية أبنائنا وفق شريعتك. آمين

"হে আল্লাহ! আমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র রিজিক দান করো এবং আমাদের তাতে বরকত দাও। আমাদের সন্তানদের তোমার শরিয়াহ অনুযায়ী লালন-পালন করার তাওফিক দাও। আমীন।"

সন্তানের প্রতি ন্যায়বিচার ও সমতাভিত্তিক আচরণ

পিতামাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো সন্তানদের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। ইসলাম সকল সন্তানের প্রতি সমান আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং পক্ষপাতিত্বকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। কারণ, পক্ষপাতিত্ব পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, সন্তানের মনে ক্ষোভ ও হতাশা জন্ম দেয় এবং তাদের মানসিক ও আবেগিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

১. সব সন্তানের প্রতি সমান আচরণ

সন্তানের প্রতি সমান আচরণ করা মানে তাদের ভালোবাসা, যত্ন, সম্পদ বণ্টন ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন হওয়া।

◇ **কুরআনের নির্দেশনা:**

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা আমানতগুলো তাদের যথাযথ হকদারদের কাছে পৌঁছে দেবে এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে।"

📖 *(সূরা আন-নিসা, ৪:৫৮)*

◇ **হাদিসের নির্দেশনা:**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের প্রতি সমান আচরণ করো, যেমন তোমরা চাও যে তারা তোমাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করুক।"

📖 *(আবু দাউদ, ৩৫২২)*

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে:

☑ সব সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহ প্রদর্শনে ভারসাম্য রাখা

☑ কাউকে বিশেষভাবে বেশি বা কম গুরুত্ব না দেওয়া

☑ পুরস্কার বা শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখা

২. কন্যা ও পুত্রসন্তানের মধ্যে ন্যায়বিচার

ইসলামের আগে অনেক সমাজে কন্যাসন্তানদের অবমূল্যায়ন করা হতো, কিন্তু ইসলাম এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয় এবং কন্যাসন্তানের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে।

◇ **কুরআনের নির্দেশনা:**

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

"যখন তাদের কেউ কন্যাসন্তানের সুসংবাদ পায়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়।"

📖 *(সূরা আন-নাহল, ১৬:৫৮)*

◇ **হাদিসের নির্দেশনা:**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—

"যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাসন্তানকে লালন-পালন করবে, তাদের প্রতি দয়া করবে এবং তাদের বিয়ে দেবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

📖 *(তিরমিজি, ১৯১৪)*

👉 **কন্যা ও পুত্রের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে:**

☑ পুত্র ও কন্যাকে সমানভাবে শিক্ষা, ভালোবাসা ও সুযোগ প্রদান করা

☑ কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে আনন্দিত হওয়া

☑ কন্যাদেরও সম্পদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা

৩. ইসলাম কী বলে পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে?

পক্ষপাতিত্ব বা এক সন্তানকে অন্যের চেয়ে বেশি ভালোবাসা বা সম্পদ দেওয়া পারিবারিক অশান্তির কারণ হতে পারে। ইসলাম এটাকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করেছে।

◇ **হাদিসের নির্দেশনা:**

একজন সাহাবি তার এক ছেলেকে সম্পত্তি দান করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এ বিষয়ে সাক্ষী হতে বললেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন—

"তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে একইভাবে দান করেছ?"

তিনি বললেন: "না।"

তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন—

"তাহলে আমি এর সাক্ষী হব না, কারণ আমি অন্যায়ের সাক্ষী হতে পারি না।"

📖 *(সহিহ মুসলিম, ১৬২৩)*

পক্ষপাতিত্ব এড়ানোর জন্য করণীয়:

☑ সম্পদ ও উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা

☑ সন্তানদের মাঝে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব না তৈরি করা

☑ তাদের যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ন্যায়বিচার করা

ন্যায়বিচার ও সমতাভিত্তিক আচরণ সন্তানের মানসিক বিকাশ ও পারিবারিক শান্তি বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। ইসলাম পিতামাতাকে তাদের সকল সন্তানের প্রতি সমান ভালোবাসা ও যত্ন প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। পক্ষপাতিত্ব পরিহার করে, কন্যা ও পুত্রের মধ্যে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে এবং সন্তানের প্রতি সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে আমরা একটি সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবার গড়ে তুলতে পারি।

.اللهم اجعلنا والدين عادلين، وأعنا على تربية أبنائنا بالعدل والرحمة .آمين

"হে আল্লাহ! আমাদের ন্যায়পরায়ণ পিতা-মাতা বানাও এবং আমাদের সন্তানদের প্রতি ন্যায়বিচার ও দয়া প্রদর্শনের তাওফিক দাও। আমীন।"

প্রযুক্তির যুগে পিতা-মাতার করণীয়

প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বর্তমান সময়ের পিতামাতাদের দায়িত্ব আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, গেমস, এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম শিশু-কিশোরদের জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার শিক্ষা না থাকলে এটি সন্তানের মানসিকতা, আচরণ, এবং নৈতিকতা নষ্ট করতে পারে। ইসলাম আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সংযম শেখায়, যা প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১. সন্তানের ইন্টারনেট ব্যবহারের নীতি

ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও ঝুঁকি

ইন্টারনেট একদিকে যেমন জ্ঞানের ভাণ্ডার, অন্যদিকে এটি মিথ্যা তথ্য, আসক্তি, এবং অনৈতিক কনটেন্টের উৎস হতে পারে। শিশুরা যদি ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার না জানে, তাহলে এটি তাদের চারিত্রিক ও মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

◇ **কুরআনের শিক্ষা:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো।"

📖 *(সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬)*

করণীয়:

- সন্তানদের ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা
- তাদের কী ধরনের ওয়েবসাইট ও অ্যাপ ব্যবহার করছে, তা পর্যবেক্ষণ করা
- সন্তানদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে তাদের ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করা
- অনলাইন নিরাপত্তা (সাইবার অপরাধ, ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা, ক্ষতিকর কনটেন্ট) সম্পর্কে সচেতন করা

২. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ক্ষতি ও সচেতনতা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেতিবাচক দিক

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক ইত্যাদি তরুণ প্রজন্মের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়। তবে এগুলোর অসতর্ক ব্যবহারে অনেক ক্ষতি হতে পারে—

🚨 ঝুঁকি:

- সময়ের অপচয় এবং আসক্তি
- আত্মবিশ্বাসের অভাব (অন্যান্য মানুষের জীবন দেখে হীনমন্যতা তৈরি হওয়া)
- অশ্লীল কনটেন্ট ও গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সমস্যা
- সাইবার বুলিং ও অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা

◇ **হাদিসের শিক্ষা:**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—

"ভালো বা মন্দ যেকোনো কাজ করার আগে চিন্তা করো, কেননা প্রতিটি কাজের জন্য তোমাদের হিসাব দিতে হবে।"

📖 *(তিরমিজি, ২৩১৭)*

☑ **পিতামাতার করণীয়:**

- সন্তানের বয়স অনুযায়ী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া
- তাদের পোস্ট, লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধু তালিকা পর্যবেক্ষণ করা
- গোপনীয়তা সেটিংস ও কনটেন্ট ফিল্টারিং ব্যবহার করা
- সময় নির্ধারণ করে দেওয়া, যেন তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার না করে
- সন্তানদের বাস্তব জীবনে বন্ধুত্ব ও সামাজিক দক্ষতা বিকাশে উৎসাহিত করা

৩. প্রযুক্তিকে উপকারীভাবে ব্যবহার শেখানো

প্রযুক্তি শুধু বিনোদনের জন্য নয়

সন্তানদের শেখাতে হবে যে প্রযুক্তি শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং এটি জ্ঞান অর্জন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে।

◇ **কুরআনের নির্দেশনা:**

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"বলুন: হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।"

📖 *(সূরা ত্বাহা, ২০:১১৪)*

☑ **উপকারী প্রযুক্তি ব্যবহারের উপায়:**

- **ইসলামিক শিক্ষা:** কোরআন শিক্ষার অ্যাপ, ইসলামিক লেকচার ও অনলাইন দারস
- **একাডেমিক শিক্ষা:** গণিত, বিজ্ঞান, ভাষা শেখার জন্য অনলাইন কোর্স
- **দক্ষতা উন্নয়ন:** কোডিং, গ্রাফিক ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, ডিজিটাল মার্কেটিং ইত্যাদি শেখানো

- **সৃজনশীলতা:** ব্লগিং, ফটোগ্রাফি, আর্ট ও ডিজাইন

৪. প্রযুক্তির প্রতি আসক্তি দূর করার কৌশল

প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং তাদের বাস্তব জীবনের দক্ষতা কমিয়ে দেয়।

🚨 **প্রযুক্তি আসক্তির লক্ষণ:**

- ফোন বা ইন্টারনেট ছাড়া অস্থিরতা
- ঘুমের সমস্যা
- পরিবারের সঙ্গে কম সময় ব্যয় করা
- পড়াশোনা বা দৈনন্দিন কাজের প্রতি মনোযোগ কমে যাওয়া

☑ **কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন?**

- পরিবারের সবাইকে প্রযুক্তি ব্যবহারের নিয়ম মেনে চলার অভ্যাস করানো
- নির্দিষ্ট সময় পর ফোন ও ট্যাব বন্ধ রাখার নিয়ম করা
- শিশুদের প্রকৃতির সাথে সময় কাটানোর সুযোগ দেওয়া (বই পড়া, খেলাধুলা, পারিবারিক আড্ডা)
- রাতে ঘুমানোর আগে ডিভাইস ব্যবহার সীমিত করা

৫. ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার

ইসলাম আমাদের সব কাজে ভারসাম্য বজায় রাখার শিক্ষা দেয়, যা প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রযুক্তি যেমন উপকারী হতে পারে, তেমনই এটি আমাদের জীবন থেকে মূল্যবান সময় কেড়ে নিতে পারে।

◇ **হাদিস:**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—

"কিয়ামতের দিন মানুষের পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে: (১) জীবন কোথায় ব্যয় করেছো? (২) যৌবন কীভাবে কাটিয়েছো? (৩) সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছো? (৪) কীভাবে ব্যয় করেছো? (৫) যা শিখেছো তা কতটুকু কাজে লাগিয়েছো?"

📖 *(তিরমিজি, ২৪১৬)*

☑ **ইসলামিক নির্দেশনা অনুযায়ী করণীয়:**

- প্রযুক্তি ব্যবহারে সংযম ও সময় নিয়ন্ত্রণ
- অশ্লীলতা ও গুনাহর কাজ থেকে দূরে থাকা
- প্রযুক্তি দিয়ে কল্যাণকর জ্ঞান অর্জন ও ছড়িয়ে দেওয়া

প্রযুক্তির যুগে পিতামাতার ভূমিকা শুধুমাত্র সন্তানদের খাবার-দাবার ও পড়াশোনার খেয়াল রাখা নয়, বরং তাদের অনলাইন জীবনও সঠিক পথে পরিচালিত করা। ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার থেকে সন্তানদের রক্ষা করা, তাদের প্রযুক্তিকে শিক্ষার ও দক্ষতার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার শেখানো এবং তাদের আসক্তি থেকে দূরে রাখার জন্য পিতামাতাকে সচেতন হতে হবে।

اللهم احفظ أبناءنا من فتن التكنولوجيا، ووفقنا لتربيتهم تربية صالحة. آمين.

"হে আল্লাহ! আমাদের সন্তানদের প্রযুক্তির ফিতনা থেকে রক্ষা করো এবং তাদের সঠিকভাবে লালন-পালন করার তাওফিক দাও। আমীন।"

সন্তানের ভুল সংশোধন ও শাস্তি প্রয়োগ

শিশুরা ভুল করবেই, কারণ তারা শিখছে এবং বেড়ে উঠছে। একজন অভিভাবক হিসেবে আমাদের প্রধান দায়িত্ব হলো ধৈর্য, ভালোবাসা ও সঠিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে তাদের ভুল শুধরে দেওয়া। ইসলাম শিশুদের প্রতি দয়া ও ন্যায়পরায়ণ আচরণের শিক্ষা দেয়। সন্তানকে শুধরানোর সময় শাস্তির প্রয়োজন হতে পারে, তবে তার সীমা থাকা জরুরি। ইসলাম কখনোই নিষ্ঠুরতা বা অন্যায় শাস্তিকে সমর্থন করে না।

১. শাস্তির ইসলামিক পদ্ধতি

ইসলাম শাস্তির ক্ষেত্রে সংযম ও ন্যায্যতার নির্দেশ দেয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিশুদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন এবং কখনো তাদের কঠিনভাবে শাস্তি দেননি।

- **কুরআনের শিক্ষা:**

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"তুমি উত্তম পদ্ধতিতে খারাপ কাজ প্রতিহত করো।"

📖 *(সূরা ফুসসিলাত, ৪১:৩৪)*

☑ **ইসলামে শাস্তির সঠিক পদ্ধতি:**

- ভুলের কারণ বোঝানো এবং বুঝিয়ে শুধরে দেওয়া
- সরাসরি চিৎকার বা অপমান না করা
- বয়স ও ভুলের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ করা
- মারধর না করা বা অপমানজনক আচরণ না করা

- প্রয়োজনে সময়সীমা নির্ধারণ করে কোনো সুযোগ থেকে সাময়িক বঞ্চিত করা (যেমন: খেলাধুলা বা ফোন ব্যবহার)

◇ **হাদিস:**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—

"তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার পরিবার ও সন্তানদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।"

📖 *(তিরমিজি, ৩৮৯৫)*

২. ভালোবাসা ও ধৈর্যের মাধ্যমে সংশোধন

শাস্তির পরিবর্তে ভালোবাসা ও ধৈর্য অনেক সময় বেশি কার্যকর হয়। যখন সন্তান ভুল করে, তখন তার সঙ্গে কড়া আচরণ না করে ধীরে ধীরে শেখানোর চেষ্টা করা উচিত।

☑ **সন্তানের ভুল সংশোধনের ধৈর্যশীল উপায়:**

- প্রথমে ভালোভাবে বোঝানো
- তার ভুল করার কারণ বোঝার চেষ্টা করা
- তার সামনে ভালো উদাহরণ স্থাপন করা
- তাকে সময় দিয়ে ধীরে ধীরে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া

◇ **রাসূলুল্লাহর দৃষ্টান্ত:**

একবার এক শিশু মসজিদে প্রস্রাব করে ফেলে, সাহাবিরা রাগান্বিত হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের থামিয়ে বলেন—

"শিশুকে ভয় দেখিও না, বরং তার ভুল ঠিক করার জন্য ধৈর্য ধরো।"

📖 *(সহিহ বুখারি, ৬১২৮)*

এখান থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে ধৈর্য ও কোমলতা দিয়ে শিশুর ভুল সংশোধন করলে তারা দ্রুত শেখে।

৩. শাস্তির সীমারেখা

শাস্তির মূল উদ্দেশ্য সন্তানের শিক্ষা ও সংশোধন। এটি কখনোই তাকে মানসিক বা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার উপায় হতে পারে না।

🚨 **শাস্তির সীমারেখা:**

❌ চিৎকার বা গালাগালি করা যাবে না

❌ অপমানজনক কথাবার্তা বলা যাবে না

❌ শারীরিক নির্যাতন করা যাবে না

❌ রাগের মাথায় শাস্তি দেওয়া যাবে না

☑ সন্তানের ভুল বোঝানোর পর তার সংশোধনের সময় দেওয়া উচিত

◇ **হাদিস:**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—

"আল্লাহ মমতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন, তাই তোমরা পৃথিবীর মানুষদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আকাশের অধিপতি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"

📖 *(তিরমিজি, ১৯২৪)*

সন্তানের ভুল সংশোধন করা ইসলামে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে এটি করতে হবে ধৈর্য, ভালোবাসা ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে। কঠোর শাস্তির বদলে বোঝানো ও ধীরে ধীরে সংশোধনের চেষ্টা করা হলে সন্তান শিখবে এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে। তাই পিতামাতার উচিত ইসলামিক নির্দেশনার আলোকে সন্তানের সঠিক লালন-পালন করা এবং তাদের ভুল শুধরানোর ক্ষেত্রে দয়ালু ও সংযমী হওয়া।

.اللهم اجعلنا والدين صالحين، ووفقنا لتربية أبنائنا بالعدل والرحمة .آمين

"হে আল্লাহ! আমাদের উত্তম অভিভাবক বানাও এবং আমাদের সন্তানদের সুবিচার ও দয়ার সঙ্গে লালন-পালন করার তাওফিক দাও। আমীন।"

প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব

সন্তান বড় হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলে পিতা-মাতার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, বরং এই পর্যায়ে তাদের নতুন এক জীবন শুরু হয়। কর্মজীবন, বিয়ে ও পারিবারিক জীবন গঠন – এসব ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা না পেলে তারা অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্ত নেয়, যা তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজের ওপর প্রভাব ফেলে। ইসলাম পিতা-মাতাকে নির্দেশ দিয়েছে যেন তারা সন্তানদের শুধু শৈশবে নয়, বরং প্রাপ্তবয়স্ক বয়সেও সঠিক পরামর্শ ও দোয়া দিয়ে সাহায্য করেন।

১. কর্মজীবন ও আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষা

ইসলাম মানুষকে পরিশ্রম করতে ও নিজ প্রচেষ্টায় জীবিকা নির্বাহ করতে উৎসাহিত করে। কর্মহীনতা ও অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা ইসলাম সমর্থন করে না। প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের উচিত হালাল জীবিকা অর্জনের জন্য চেষ্টা করা এবং কর্মঠ হওয়া।

◇ **কুরআনের নির্দেশনা:**

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

"মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে লাভ করে।"

📖 *(সূরা আন-নাজম, ৫৩:৩৯)*

☑ **পিতা-মাতার করণীয়:**

- সন্তানদের দায়িত্বশীল হতে শেখানো
- হালাল উপার্জনের গুরুত্ব বোঝানো
- কর্মজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনে উৎসাহ দেওয়া
- কষ্ট ও পরিশ্রমের মূল্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া
- সন্তানদের আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা, যাতে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে

◇ **হাদিস:**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—

"কেউ যদি নিজ হাতে উপার্জন করা খাদ্য গ্রহণ করে, তবে তা সর্বোত্তম উপার্জন।"

📖 *(সহিহ বুখারি, ২০৭২)*

২. বিয়ে ও পরিবার গঠনে দিকনির্দেশনা

ইসলাম বিয়েকে শুধু পারিবারিক বন্ধন নয়, বরং ইবাদত হিসেবে ঘোষণা করেছে। সন্তানদের যথাযথ বয়সে বিয়ে করানো এবং সঠিক জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা তাদের জন্য শান্তি ও কল্যাণের কারণ হয়।

◇ **কুরআনের নির্দেশনা:**

وَأَنكِحُوا ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

"তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিয়ে সম্পন্ন করে দাও এবং যারা তোমাদের গোলাম ও দাসী, তাদেরও যদি তারা সৎ হয়। যদি তারা দরিদ্র হয়, তাহলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব দূর করে দেবেন।"

📖 *(সূরা আন-নূর, ২৪:৩২)*

☑ **পিতা-মাতার করণীয়:**

- সন্তানদের সময়মতো বিয়ের জন্য উৎসাহিত করা
- পাত্র-পাত্রীর চরিত্র ও ধর্মীয় অনুশীলনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া
- বিয়ে সহজ করার জন্য যৌতুক ও অতিরিক্ত খরচ পরিহার করা
- বিয়ের পর তাদের দাম্পত্য জীবনের সমর্থন ও পরামর্শ দেওয়া

◇ **হাদিস:**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—

"যখন কোনো ব্যক্তি তোমাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, যার চরিত্র ও দ্বীন তোমাদের পছন্দ হয়, তখন তার বিয়ে দিয়ে দাও। যদি তা না করো, তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বড় ফেতনার সৃষ্টি হবে।"

📖 *(তিরমিজি, ১০৮৪)*

৩. দাম্পত্য জীবনের শিক্ষা দেওয়া

সুখী দাম্পত্য জীবন গঠনের জন্য স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে জানা জরুরি। সংসার জীবনে ধৈর্য, সহনশীলতা ও পারস্পরিক সম্মান থাকলে দাম্পত্য জীবন সুখী হয়।

◇ **কুরআনের শিক্ষা:**

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।"

📖 *(সূরা আন-নিসা, ৪:১৯)*

☑ **পিতা-মাতার করণীয়:**

- সন্তানদের দাম্পত্য জীবনে দায়িত্বশীলতার শিক্ষা দেওয়া
- স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অধিকার ও কর্তব্য বোঝানো
- ধৈর্য, সহনশীলতা ও পারস্পরিক সম্মান শেখানো
- ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলা এবং সমস্যা সমাধানে ধৈর্য ধরতে বলা

◇ **হাদিস:**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।"
🕮 *(তিরমিজি, ৩৮৯৫)*

প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব কখনো শেষ হয়ে যায় না। কর্মজীবনে তাদের সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা, বিয়ে ও সংসার জীবনে উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া এবং তাদের জন্য দোয়া করা প্রতিটি পিতা-মাতার কর্তব্য। ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী, পিতা-মাতার উচিত সন্তানের আত্মনির্ভরশীলতা, সঠিক জীবনসঙ্গী নির্বাচন ও সংসার জীবনের জন্য নৈতিক শিক্ষা দেওয়া, যাতে তারা সুখী ও সফল জীবন গড়ে তুলতে পারে।

اللهم اجعل أبناءنا صالحين، ووفقهم في حياتهم الزوجية والعملية، وارزقهم الرزق الحلال. آمين.

"হে আল্লাহ! আমাদের সন্তানদের সৎ বানাও, তাদের কর্মজীবন ও দাম্পত্য জীবনে সফলতা দাও এবং তাদের হালাল রিজিক দাও। আমীন।"

পিতা-মাতার অবহেলার ফলাফল

পিতা-মাতা হলেন সন্তানের প্রথম শিক্ষক এবং জীবন গড়ার মূখ্য সহায়ক। তাদের অবহেলা বা দায়িত্বহীন আচরণ সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নয়নে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। সন্তান যখন পর্যাপ্ত ভালোবাসা, শিক্ষা, সুরক্ষা এবং দিকনির্দেশনা না পায়, তখন তারা বিপথগামী হয়ে উঠতে পারে, যা পরিবারের পাশাপাশি সমাজের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইসলাম পিতা-মাতার ওপর সন্তানদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সঠিকভাবে লালন-পালন করার কঠোর নির্দেশনা দিয়েছে।

১.কতক সন্তান অশান্তি ও আযাবের কারণ হয়

সন্তান হওয়াটা যেমনিভাবে নিয়ামত হয়, অনুরূপভাবে কখনো না হওয়াটাও নিয়ামত হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্য যাদের সন্তান হয় নি অথবা হয়ে মারা গেছে তাদের আরও বেশি শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

বর্তমানে বেশিরভাগ সন্তান আল্লাহ বিমুখ হয়। এমতাবস্থায় যাদের সন্তান নেই তাদের এটা ভেবে শুকরিয়া আদায় করা দরকার যে, আল্লাহপাক তাদেরকে বিভিন্ন চিন্তা-পেরেশানী হতে মুক্ত রেখেছেন। তাই তাদের এক মনে আল্লাহর স্মরণে নিজেদের বিভোর করে রাখা উচিত।

অনেকের ক্ষেত্রে সন্তানাদি আযাবের কারণ হয়। যেমন মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا

“হে নবী! মুনাফিকদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। নিশ্চয় আল্লাহ এসব দ্বারা পার্থিব জীবনে তাদের শাস্তি দিতে চান।"

বাস্তবে অনেকের জন্য সন্তানাদি বিপদ-মুসিবতের কারণ হয়। শৈশবে তাদের পেশাব-পায়খানা হতে সতর্ক না থেকে নামায নষ্ট করে দেয়। আর সন্তান বড় হলে তাদের জন্য অভিভাবকদের সবসময় চিন্তার মধ্যে থাকতে হয়। সন্তান কীভাবে গাড়ী-বাড়ী বানাবে, বেশি আয় উপার্জন করবে। চাই এতে দ্বীনদারী বহাল থাক বা না থাক। সন্তানের জন্য তাদের দিনরাত দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, হালাল-হারাম বিচার করা সম্ভব হয় না। সন্তানের কারণে যাদের এহেন পরিণতি হয়, তাদের জন্য সন্তান না হওয়াটাই নিয়ামত।

(আদ দুনিয়া-১০০)

২.হযরত খিযির (আ.)-এর ঘটনা

কুরআন শরীফে আছে, হযরত খিযির (আ.) জনৈক বালককে হত্যা করেছিলেন। এই হত্যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে নৃশংস মনে হলেও বাস্তবে এর মধ্যে ঐ বালক ও তার পিতামাতার জন্য কল্যাণই ছিল।

বর্ণনাসূত্রে জানা যায় যে, ঐ বালক মারা যাবার পর আল্লাহ তা'আলা তার পিতামাতাকে একটি কন্যা সন্তান দান করেন, যার সন্তানদের মধ্যে অনেক নবী-রাসূল জন্মগ্রহণ করেন।

যদি আপনার কোন পুত্র হয় আর সে এ বালকদের মত হয় যাকে হযরত খিযির (আ.) হত্যা করেছিলেন, তাহলে আপনার করার কী ছিল? এটা আল্লাহ্‌তা'আলার বড় অনুগ্রহ যে, তিনি আপনাকে কন্যা সন্তান দান করেছেন। কেননা সাধারণত মেয়েরা বংশের বদনাম করে না। তারা পিতামাতার খুবই অনুগত হয়। পক্ষান্তরে বর্তমানে ছেলেরা এত বেয়াড়া হয় যে, হওয়ার চেয়ে না হওয়াটাই বেশী ভাল মনে হয়। এমতাবস্থায় হযরত খিযির (আ.) তাদের হত্যা না করলেও আল্লাহ তো জবাই করতে পারেন। আল্লাহ পাকের সৃষ্টি না করাটাই অথবা সৃষ্টি করে মৃত্যু দেয়াটা তাদের এক ধরনের জবাইয়ের মত।

আল্লাহপাক যাকে নিঃসন্তান রাখেন, তার মধ্যেই তার কল্যাণ নিহিত। কেননা আল্লাহ মানুষটির কল্যাণ সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। যাদের সন্তান নেই তারা নিশ্চিন্তায় দ্বীনী কাজে রত থাকেন। এখন যদি তাদের সন্তান হয়, তাহলে কি তারা পূর্বের মত নিশ্চিন্তায় থাকতে পারবেন? কখনো না। কেননা সন্তান মানেই হাজারো চিন্তার মাঝে নিমজ্জিত হওয়া।

৩. সন্তানের বিপথগামিতার কারণ

সন্তানের বিপথগামিতা একাধিক কারণে হতে পারে, যার মধ্যে অন্যতম হলো পিতা-মাতার অবহেলা। যখন সন্তানদের প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ, ভালোবাসা ও সময় দেওয়া হয় না, তখন তারা সঠিক পথে চলতে ব্যর্থ হয় এবং নানা ধরণের বিপথগামী কাজের দিকে ধাবিত হতে পারে।

- **কুরআনের নির্দেশনা:**

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সঠিক পথে প্রবেশ করাও এবং আমাকে সঠিক পথ থেকে বের করে আনো এবং আমাকে তোমার কাছ থেকে শক্তিশালী সাহায্য দাও।"

📖 *(সূরা আল-ইসরা, ১৭:৮০)*

☑ **সন্তানের বিপথগামিতার কারণ:**

- পিতা-মাতার অতিরিক্ত শাস্তি বা নিষেধাজ্ঞা
- পিতা-মাতার দৃষ্টিকোণ থেকে সন্তানের চাহিদাগুলোর অবজ্ঞা
- পরিবারে অশান্তি ও অস্থিরতা
- একঘেয়ে জীবনযাপন এবং মন্দ প্রভাবিত পরিবেশ
- শিক্ষার প্রতি অজ্ঞতা এবং না শেখানো

◇ **হাদিস:**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—

"সন্তানদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো ভালোবাসা ও সহানুভূতির মাধ্যমে তাদের পরিচর্যা করা।"

📖 *(আবু দাউদ, ৪৯৯৮)*

৪. অবহেলার কারণে সন্তানের মানসিক ক্ষতি

পিতা-মাতার অবহেলা সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যেও গভীর ক্ষতির কারণ হতে পারে। যখন সন্তান তার পিতা-মাতার কাছ থেকে উপযুক্ত পরিচর্যা, ভালোবাসা ও সঠিক দিকনির্দেশনা পায় না, তখন তার মধ্যে আস্থাহীনতা, হতাশা, দুশ্চিন্তা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয়।

☑ **মানসিক ক্ষতির লক্ষণ:**

- আত্মবিশ্বাসের অভাব
- সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা
- উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা
- পিতা-মাতার প্রতি রাগ ও বিদ্বেষ
- বিভিন্ন মানসিক রোগের সৃষ্টি (যেমন: অবসাদ, স্ট্রেস, অ্যানজাইটি)

◇ **কুরআনের শিক্ষা:**

فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

"অতএব, যেসব এতিমরা দুর্বল, তাদের ওপর অত্যাচার করো না।"

📖 *(সূরা আদ-দুহা, ৯)*

☑ পিতা-মাতার করণীয়:

- সন্তানের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল আচরণ
- তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিয়ে খেয়াল রাখা
- সন্তানের সমস্যা শুনে, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি রাখা
- তাদের ভালোবাসা ও নিরাপত্তা প্রদান করা

৫ .পরিবার ও সমাজের উপর নেতিবাচক প্রভাব

পিতা-মাতার অবহেলা শুধু সন্তানের উপরই প্রভাব ফেলে না, বরং তা পুরো পরিবার ও সমাজের ওপরও বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। যখন সন্তানের শৈশবের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সঠিক নির্দেশনা ও ভালোবাসা না পায়, তখন তার জীবনেও অস্থিরতা দেখা দিতে পারে এবং সে পরিবারের জন্য দায়ী হতে পারে।

☑ পারিবারিক প্রভাব:

- পারিবারিক অশান্তি ও ভাঙ্গন
- সন্তানদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি
- পিতামাতার মধ্যে অভিযোগ এবং বিরোধ

☑ সামাজিক প্রভাব:

- অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি
- মাদকাসক্তি ও অন্যান্য বিপথগামী কার্যকলাপে আকৃষ্ট হওয়া
- সামাজিক নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবমূল্যায়ন

◇ **হাদিস:**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—

"যে ব্যক্তি তার সন্তানকে সৎ শিক্ষা দেয়, সে তার সন্তানের জন্য পৃথিবীতে সুখ এনে দেয় এবং আখিরাতে তার জন্য স্বর্গের পথ সুগম করে।"

📖 *(আবু দাউদ, ৫১৫৮)*

পিতা-মাতার অবহেলা সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতার জন্য এক বড় হুমকি। ইসলাম পিতা-মাতাকে তাদের সন্তানের প্রতি সদাচরণ, ভালোবাসা এবং সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। সন্তানের বিকাশের জন্য পরিবেশ ও শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং সঠিক পরিচর্যার অভাব তাদের বিপথগামী হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে। অতএব, পিতা-মাতার উচিত সন্তানের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা, যাতে তারা সঠিক পথ অনুসরণ করে সমাজে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারে।

.اللهم اجعلنا من الأبناء البارين بوالدينا، ووفقنا لإعطائهم الرعاية والاهتمام الكامل .آمين

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের পিতা-মাতার প্রতি অনুগত করো, এবং তাদের যথাযথ যত্ন ও সেবা দেওয়ার তাওফিক দাও। আমীন।"

আদর্শ পিতা-মাতা হওয়ার উপায়

আদর্শ পিতা-মাতা হওয়ার এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সন্তানের জীবনে। ইসলামে পিতা-মাতা হলেন সন্তানের প্রথম শিক্ষক এবং তাদের আচরণ, শিক্ষা ও দিকনির্দেশনায় সন্তানের ভবিষ্যত নির্ভর করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবাদের জীবন থেকে আদর্শ পিতা-মাতা হওয়ার অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। তাদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে আধুনিক সমাজেও সফল ও আদর্শ পিতা-মাতা হওয়া সম্ভব।

১. রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের উদাহরণ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তার সাহাবারা ছিলেন আমাদের জীবনের আদর্শ। তাদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা আমাদের সন্তানদের যথাযথভাবে লালন-পালন করতে পারি। তাদের আদর্শ আচরণ, সহানুভূতি, দয়া, এবং প্রতিটি সিদ্ধান্তে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা সন্তানের সঠিক বিকাশে সহায়ক হতে পারে।

- **রাসূল (সা.) এর পিতৃত্ব:**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন একজন আদর্শ পিতা, যার প্রতি তিনি সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং সময় দিতেন। তিনি তার সন্তানদের শিক্ষা দিতেন এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবনে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহিত করতেন।

☑ **উদাহরণ:**

- রাসূল (সা.) যখন তার মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতেন, তখন তাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। তিনি বলতেন, **"তোমরা যদি পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকেও হারিয়ে যাও, তবে আমি তোমাদের পাশে থাকব।"**
- রাসূল (সা.) তার মেয়েদের হালাল উপার্জন, আত্মসম্মান এবং সৎ জীবনযাপন শিখিয়েছিলেন।

- **সাহাবীদের পিতৃত্ব:**

সাহাবীগণও ছিলেন আদর্শ পিতা-মাতা। তারা নিজেদের সন্তানদের সাথে সময় কাটাতেন এবং তাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহর উপদেশ অনুসরণ করতেন।
উদাহরণস্বরূপ, সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) তার সন্তানদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাদের শিক্ষাদানে প্রভাবিত করতেন।

২. আধুনিক যুগে আদর্শ পিতা-মাতা হওয়ার পদ্ধতি

আধুনিক যুগে যেখানে সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন দ্রুত ঘটছে, সেখানে আদর্শ পিতা-মাতা হওয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু ইসলামের নির্দেশনা এবং রাসূল (সা.) ও সাহাবাদের জীবন আমাদের দিকনির্দেশনা দেয়, যা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা সম্ভব।

☑ **আধুনিক পিতা-মাতার করণীয়:**

1. **সন্তানদের ভালোবাসা ও মনোযোগ দেওয়া:** আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা সত্ত্বেও সন্তানের প্রতি সঠিক মনোযোগ এবং ভালোবাসা প্রদান অপরিহার্য।
2. **শিক্ষা প্রদান:** শুধু শারীরিক দেখভাল নয়, শিক্ষা দিতে হবে মননশীল, নৈতিক এবং ধর্মীয় জ্ঞান।
3. **সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ:** সন্তানদের মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতি, পরিবারিক মূল্যবোধ, এবং মানবিক গুণাবলী গড়ে তোলা।
4. **প্রযুক্তির ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ:** সন্তানদের প্রযুক্তির ব্যবহার শেখানোর পাশাপাশি তাদের নিরাপত্তা এবং মানসিক বিকাশ নিয়ে নজর রাখা।
5. **ধৈর্য ও সহানুভূতি:** সন্তানের ভুলগুলোতে ধৈর্য এবং সহানুভূতির মাধ্যমে তাদের সংশোধন করা।
6. **আল্লাহর সন্তুষ্টি:** সবসময় আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য রেখে সন্তানদের সেবা করা।

৩. সফল পিতা-মাতার গুণাবলী

আদর্শ পিতা-মাতা হতে গেলে কিছু গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, যা সন্তানের সঠিক বিকাশ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

☑ **সফল পিতা-মাতার গুণাবলী:**

1. **সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি:**
   পিতা-মাতার ভালোবাসা এবং সহানুভূতি সন্তানের মনোবল এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
2. **শিক্ষায় মনোযোগী:**
   সন্তানের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ও সচেতন হওয়া, তাদের ভালোভাবে পড়াশোনা করতে উৎসাহিত করা।
3. **আল্লাহর পথে দীক্ষিত:**
   সন্তানের সামনে ইসলামিক নীতিমালা তুলে ধরা এবং তাদের আত্মিক উন্নতি নিশ্চিত করা।
4. **উদাহরণ সৃষ্টি:**
   আদর্শ পিতা-মাতা হওয়া মানে শুধু কথা বলা নয়, বরং তাদের ব্যক্তিগত জীবনেও ভালো উদাহরণ সৃষ্টি করা।
5. **ধৈর্য এবং সৎ সাহস:**
   সন্তানের কোনো সমস্যায় পিতা-মাতা যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারেন এবং সঠিক

পথ দেখাতে পারেন, তবে তারা সফল পিতা-মাতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

আদর্শ পিতা-মাতা হওয়া একটি চ্যালেঞ্জ, তবে ইসলামিক শিক্ষা ও রাসূল (সা.) ও সাহাবাদের জীবন অনুসরণ করে এই পথে সফল হওয়া সম্ভব। সন্তানের জীবনকে সঠিকভাবে গঠন করার জন্য পিতা-মাতাকে হতে হবে ধৈর্যশীল, শিক্ষা প্রদানকারী, ভালোবাসা ও সহানুভূতির প্রতীক, এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার এক অটুট প্রতিশ্রুতি।

اللهم اجعلنا من الآباء والأمهات الصالحين الذين يربون أولادهم على الخير والصلاح. آمين.

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে সৎ এবং আদর্শ পিতা-মাতা বানাও, যারা তাদের সন্তানদের সঠিক পথে গড়ে তুলবে। আমীন।"

সন্তান লালন-পালনে আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা (Emotional Intelligence for Parenting)

আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা (Emotional Intelligence বা EI) সন্তানের সঠিক বিকাশে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সন্তানদের আবেগের প্রতি সচেতনতা, তাদের অনুভূতিগুলো বুঝতে পারা এবং সঠিকভাবে তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা একজন পিতা-মাতার জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে, বিশেষত আধুনিক সমাজে যেখানে প্রযুক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে, ইসলামের শিক্ষা এবং রাসূল (সা.)-এর উদাহরণ অনুসরণ করে পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের সঠিকভাবে আবেগীয় শিক্ষা দিতে পারে।

১. সন্তানের কারণে নানা চিন্তা ও ঝামেলা

সন্তানের সাথে নানা সমস্যা লেগেই থাকে। কারো কানে ব্যথা। কারো পেটে যন্ত্রণা। কেউ পড়ে গিয়ে আহত হয়। কেউবা আবার হারিয়ে যায়। আর এতে করে পিতামাতার দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। এমতাবস্থায় আল্লাহ যাকে সন্তান দেন না, তাকে এ কারণেই দেন নি যে, তিনি তাকে এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখতে চান।

আমার ভাই একটি ঘটনা শুনান। এক ব্যক্তির বাড়ীতে অনেক সন্তান ছিল। কিছু নিজের আর কিছু সন্তানের সন্তান। একবার জনৈক লোক তাকে জিজ্ঞাসা করে ভাই! ভাল আছেন? বাড়ীর সবাই ভাল তো? এতে লোকটি ক্ষেপে যায় এবং বলে, আপনারা সুখে আছেন বলে আমাকে বদদু'আ দিচ্ছেন? আমার জীবনে সুখ কোথায়? নিজের ছেলে আছে, মেয়ে আছে। তাদেরও

সন্তান কম না। মোট মিলে বাচ্চা দ্বারা আমার বাড়ী ভরা। আজ কারো কানে ব্যথা। কারো বারবার পাতলা পায়খানা হচ্ছে। কারো চোখ উঠেছে। কেউ খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়ে কাঁদছে। যার ঘরের অবস্থা এমন সে কী করে ভাল থাকতে পারে? ভাল কেবল সেই থাকতে পারে যে নিঃসন্তান; কোন ছেলে-মেয়ে নেই।

বাস্তবে যে বাড়ীতে বাচ্চা থাকে সেখানে একটু না একটু সমস্যা থাকেই। বাচ্চা যত দিন ছোট থাকে ততদিন পিতামাতার একটু কষ্ট ও দুশ্চিন্তা থাকেই।
সন্তান একটু সুস্থ হলে পিতামাতার ধড়ে প্রাণ ফিরে আসে। সন্তানের শরীর একটু খারাপ হলেই পিতামাতার জীবন বিস্বাদ হয়ে যায় সন্তানের মুখে হাসি ফোটার আগে তাদের মুখে হাসি ফোটে না।

এরপর সন্তান যখন বড় হয়, তখন তার বিবাহ-শাদীর প্রয়োজন দেখা দেয়। বিবাহের পরে সন্তানের ঘরে তার সন্তান আসে। তখন নিজের সন্তানের মত আবার ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। নানান চিন্তা ও ব্যস্ততা তাকে ঘিরে ধরে। আল্লাহ আল্লাহ করে যে সমস্ত কষ্ট-চিন্তা থেকে পরিত্রাণ লাভ হয়েছিল, আবার তার সূচনা হয়। ও দিকে সন্তানের যদি সন্তান না হত, তাহলে সেটাও ছিল আরেক পেরেশানী। চিন্তা হত, কেন নাতি হয় না? হলেও সুখ নেই। সন্তান হওয়া মানেই হাজারো ঝামেলা ও চিন্তার দুয়ার খোলা।

মোটকথা, সন্তান এক বিরাট ঝামেলার বিষয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল, কেউ এর থেকে মুক্ত না। এমনকি এই ঝামেলা মানুষের এত সওয়া (সহ্যকর) হয়ে গিয়েছে যে, সন্তান না থাকলেই বরং সে বিচলিত হয়ে ওঠে। ঘরে সন্তান না থাকলে ঘর ফাঁকা লাগে। নিঃসঙ্গ মনে হয়। দিন-রাত একান্ত উদাসীন ও অলসভাবে কাটে। (আত তাবলীগ-২৪)

১. আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা (EI) কী?
আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা (EI) হলো একজন ব্যক্তির নিজের আবেগ এবং অন্যদের আবেগ বোঝার এবং সেগুলির প্রতি সঠিক প্রতিক্রিয়া জানার ক্ষমতা। একজন আবেগী বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার অনুভূতি বুঝে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যদের অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং তাদের সঙ্গেও সঠিকভাবে মিথস্ক্রিয়া করতে সক্ষম হয়। সন্তান লালন-পালনে, EI একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা সন্তানের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য জরুরি।
শিশুর আবেগ প্রতিকার:

আমাদের ছোট্ট সোনামণিদের বড় হওয়ার পথটা শুধু শারীরিক বেড়ে ওঠায় সীমাবদ্ধ নয়—এটা এক দীর্ঘ আবেগীয় ভ্রমণও। সেই ভ্রমণে তারা কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়, আবার কোনো সময় ভীষণভাবে ব্যথিতও হয়। এই মানসিক আঘাতগুলোকে বলে **"Emotional Wounds"**, মানে আবেগগত ক্ষত।

এমন নয় যে শুধু আপনার বা আমার সন্তানই এমন কিছু অনুভব করছে—এই দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি শিশু জীবনের কোনো না কোনো সময়ে আবেগীয় ধাক্কা খায়। কিন্তু সবাই তো একভাবে সেটা সামলে উঠতে পারে না, তাই না? কেউ ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে জমিয়ে রাখে সেই ব্যথাগুলো, আর কেউ আবার সঠিক সহানুভূতি পেলে ধীরে ধীরে সেরে ওঠে—তার ভেতরের শিশুটা সুস্থ হয়ে ওঠে।

আসলে পার্থক্যটা এখানেই:

আঘাত হয়ত সবাই পায়, কিন্তু **সেরে ওঠা সবার হয় না।**

আমাদের দায়িত্ব কী?

পিতা-মাতা, অভিভাবক কিংবা শিক্ষক হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো—সেই "ভেতরের শিশু"টাকে সঠিক সময় ও ভালোবাসা দিয়ে আরেকবার হাসাতে শেখানো।

এই সিরিজে আমরা ইন শা আল্লাহ ধাপে ধাপে এই বিষয়টা আলোচনা করব—কীভাবে আমরা আমাদের সন্তানদের আবেগগত দিকগুলো সঠিকভাবে বুঝে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি।

"Healed Inner Child" বনাম "Wounded Inner Child"

আসুন দেখি, একজন সুস্থ আবেগের শিশু ও একজন আহত আবেগের শিশুর মধ্যে কী কী পার্থক্য দেখা যায়।

☑ **"Healed Inner Child" – সুস্থ আবেগীয় শিশুর লক্ষণ:**

- **আত্মগ্রহণযোগ্যতা:**

সে নিজের প্রতি সন্তুষ্ট। ভাবে—"আমি যেমন, তেমনই ঠিক আছি।" নিজেকে অন্য কারো সঙ্গে তুলনা না করেই ভালোবাসতে শেখে।

- **স্বাধীন আত্মবিশ্বাস:**

সব সময় প্রশংসা বা বাহবা দরকার হয় না তার। কেউ না বললেও সে নিজের কাজের গুণ বুঝতে পারে।

- **শান্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ মন:**

ঝামেলার মাঝেও মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে। সহজে রেগে যায় না, বরং সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করে।

◇ **সহনশীলতা ও সহানুভূতি:**

নিজে কষ্ট পেলে অন্যের কষ্টও বুঝতে শেখে। এমন শিশু অন্যদের প্রতিও মমতাশীল হয়।

◇ **নিজেকে সময় দিতে শেখে:**

সবসময় গ্যাদারিং, স্ক্রিন বা চিৎকারের মধ্যে না থেকে একা বসে চিন্তা করতে বা বই পড়তে ভালোবাসে।

◇ **ইতিবাচক মনোভাব:**

জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় আশাবাদী। সমস্যা হলে হতাশ না হয়ে সমাধান খোঁজে।

🎯 বাস্তব গল্প: "রাফি ও তার শিক্ষা"

রাফি (১০ বছর বয়সী) একদিন একটি স্কুল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও সে বিজয়ী হতে পারেনি। মনটা একটু খারাপ হয়েছিল, চোখে জলও এসেছিল।
কিন্তু তার বাবা-মা তার পাশে এসে বসে বললেন,
"তুমি অসাধারণ খেলেছো! হার-জিত থাকবেই, কিন্তু তুমি পরেরবার আরও ভালো করবে ইন শা আল্লাহ।"
রাফির মনটা ধীরে ধীরে হালকা হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল, এই হার মানে শেষ নয়—এটা শেখার একটা সুযোগ। পরদিন সকালেই সে আবার হাসিমুখে অনুশীলনে নেমে পড়ল।
এই ছোট্ট ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, **কীভাবে একটুখানি সহানুভূতি আর কথার জাদু একটি শিশুর আবেগীয় ক্ষতকে সারিয়ে তুলতে পারে।**

🦻 আঘাতপ্রাপ্ত শিশুমন: Wounded Inner Child ও তার পরিণতি

শিরোনাম: "অভিমানী মন নিয়ে বড় হওয়া: শিশুকালের আবেগীয় ক্ষত কীভাবে প্রভাব ফেলে পুরো জীবনজুড়ে?"

একটি ছোট্ট মেয়ে—নাম রুমি। সে একদিন খুশিমনে মায়ের আঁকা একটি ফুলের ছবি কপি করে আঁকলো। ছবি শেষ করে মায়ের সামনে গিয়ে হাসিমুখে বলল, "দেখো মা, তোমার মত আমিও পারি।"
মা তখন রান্নায় ব্যস্ত, একবার তাকিয়ে বললেন, "আহ! এসব করতে সময় নষ্ট করছিস কেন? পড়তে যা।"
রুমি কোনো শব্দ করলো না। কিন্তু তার মুখটা একটু থেমে গেল। সে ভাবলো, **"আমার কাজটা কি মূল্যহীন?"**
এই ছোট্ট কথাটি এক ফোঁটা বিষ হয়ে তার মনে ঢুকে গেল।
দিনের পর দিন এমন ছোট ছোট অবহেলা জমতে থাকলে একটি শিশু ভেতরে ভেতরে আহত হতে থাকে। এই অবচেতন আহত মনই হলো:

💔 Wounded Inner Child (আঘাতপ্রাপ্ত শিশুমন) কী?

এটি হলো সেই শিশুমনের অংশ, যেটি ছোটবেলায় অপূর্ণ ভালোবাসা, উপেক্ষা, অপমান, ভয়, তিরস্কার, বা যেকোনো আবেগীয় আঘাত পেয়েছে এবং তা থেকে নিরাময় (healing) পায়নি। এই "আঘাতপ্রাপ্ত অংশ" বড় হয়ে আমাদের আত্মবিশ্বাস, সম্পর্ক, আত্মসম্মানবোধ ও আবেগপ্রবণতার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে—যদিও বাইরে থেকে তাকে বোঝা যায় না।

😢 লক্ষণসমূহ: কীভাবে চিনবেন Wounded Inner Child?

- ◇ সবসময় "আমি ঠিক নই" – এমন এক অনুভূতি লুকিয়ে থাকে।
- ◇ অতিরিক্ত ভয়, নিরাপত্তাহীনতা ও আত্মগ্লানি কাজ করে।
- ◇ মানুষের স্বীকৃতি পেতে মরিয়া হয়ে ওঠে।
- ◇ ছোট কথায় ভেঙে পড়ে বা অতিরিক্ত রাগ দেখায়।
- ◇ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে ভয় পায় বা নিজেকে যোগ্য মনে করে না।
- ◇ আত্মসম্মান কমে যায়, নিজের সিদ্ধান্তে সন্দেহ কাজ করে।
- ◇ একা থাকতে ভয় পায়, নিজেকে মূল্যহীন ভাবে।
- ◇ অতীতের তিক্ত স্মৃতি ভুলে যেতে পারে না।

▯ ভবিষ্যতের ঝুঁকি ও পরিণতি

Wounded Inner Child যদি নিরাময় না পায়, তবে এটি প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায়:

- ▽ মানসিক অবসাদ (ডিপ্রেশন)
- ▽ অতিরিক্ত রাগ বা হঠকারী সিদ্ধান্ত
- ▽ দাম্পত্য জীবনে অশান্তি
- ▽ কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসহীনতা
- ▽ নিজের সন্তানদের সাথেও আবেগের দূরত্ব সৃষ্টি করে
- ▽ নিজেকে ভালোবাসতে পারে না, ক্ষমা করতে শেখে না

অর্থাৎ, একটি অসুস্থ শিশুমন, একদিন এক অসুখী, অসংলগ্ন প্রাপ্তবয়স্কে পরিণত হয়—যার ব্যথা তার পরিবার, সমাজ এমনকি তার সন্তানেরাও বহন করে।

🌼 তাহলে কী করণীয়?

❶ প্রথম ধাপ: বুঝে নেওয়া—**"হ্যাঁ, আমার ভেতরে এখনও সেই শিশুটি আছে, যে একদিন কষ্ট পেয়েছিল।"**

❷ দ্বিতীয় ধাপ: নিজের সঙ্গে সহানুভূতি—“আমি দোষী নই, আমি তো ছোট ছিলাম।”
❸ তৃতীয় ধাপ: সন্তানের সামনে সচেতনভাবে কথা বলা, অনুভব করা—তার ভেতরে যেন একই রকম ‘আঘাত’ না জন্মায়।
❹ চতুর্থ ধাপ: থেরাপি, কাউন্সেলিং বা ইসলামিক আত্মিক প্রশিক্ষণ—যা আপনাকে ভেতর থেকে নিরাময়ের পথে নিয়ে যাবে।

▧ বাস্তব উদাহরণ – রুমির গল্পের শেষ:
রুমি বড় হয়ে গেল। কিন্তু আজও তার মনে ভয়—“আমি ভালো কিছু করতে পারি না।” যখন তার সন্তান একটি ছবি আঁকে এবং সে সেই একই ভুল করে—“এইসব কিসের আঁকাআঁকি?”
ঠিক তখনি রুমি থমকে যায়। নিজেকে প্রশ্ন করে, “আমি কি আবার একটা শিশুমন ভাঙছি?”
সে জোরে হাসে, সন্তানের দিকে তাকিয়ে বলে,
“এই ছবিটা অসাধারণ হয়েছে, আমার ছোট্ট শিল্পী!”
হয়তো ঠিক এই মুহূর্তেই তার ভেতরের সেই আহত শিশুটিও একটু একটু করে সুস্থ হতে শুরু করে...
আঘাতপ্রাপ্ত শিশুমনকে লুকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু মুক্ত করা যায় না যতক্ষণ না আপনি সচেতন হন, বুঝে তাকে আলতো করে নিরাময় করেন।
আর আমাদের সন্তানেরা?
তারা যেন “Wounded” না হয়—সে দায়িত্ব এখন **আমাদেরই।**

২. ইসলামে আবেগ নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা
ইসলামে আবেগ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন, বিশেষত রাগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। রাসূল (সা.) ও সাহাবাদের জীবন থেকে আমরা আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার শিক্ষা নিতে পারি।

- **রাসূল (সা.)-এর ধৈর্য ও কোমলতার উদাহরণ:**

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিনি তার পরিবার, সাহাবী এবং সাধারণ মানুষের সাথে সদয় আচরণ করতেন, বিশেষত যখন তারা কিছু ভুল করত। তার ধৈর্য এবং কোমলতা তার পিতা-মাতা হওয়ার আদর্শ ছিল।

☑ উদাহরণ:

- রাসূল (সা.) যখন তার সাহাবীদের কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, তখন তিনি উত্তেজনা বা রাগের কোনো প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতেন না, বরং তারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য ধৈর্য ধারণ করতেন।
- একটি হাদিসে তিনি বলেছেন: **"যে ব্যক্তি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, আল্লাহ তাকে এক বিশেষ মর্যাদা দান করেন।"** *(তিরমিজি, ২০০৯)*

◇ **কুরআন ও হাদিসে রাগ নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা:**

কুরআনে এবং হাদিসে রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

কুরআন:

"আর যারা রেগে গিয়ে ক্ষমা করে দেয়, তারা আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ।"

📖 *(সূরা আশ-শুরা, ৪২:৪৩)*

হাদিস:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন—

"তুমি যখন রেগে যাও, তখন চুপ থাকো।" *(বুখারি, ৫৬)

৩. সন্তানের আবেগ বুঝতে শেখা

একজন আদর্শ পিতা-মাতা হিসাবে সন্তানের আবেগকে বুঝতে শেখা অত্যন্ত জরুরি। সন্তানদের ভয়, কষ্ট, আনন্দ এবং হতাশা অনুভব করার মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব।

☑ **সন্তানের ভয়, কষ্ট ও আনন্দ অনুভব করা:**

- সন্তানের ভয় বা কষ্ট যদি পিতামাতা বুঝতে পারে, তবে তারা সন্তানের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে সঠিকভাবে তাদের সহায়তা করতে পারে।
- সন্তানদের আনন্দে অংশগ্রহণ করা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। তাদের খুশি মুহূর্তে তাদের পাশে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ।

☑ **সন্তানের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা:**

সন্তানদের সামনে তাদের আবেগের ব্যাপারে খোলামেলা আলোচনা করা এবং তাদের অনুভূতিকে গুরুত্ব দেয়া আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে।

☑ **নরম ভাষায় সন্তানের সাথে কথা বলা:**

সন্তানের সঙ্গে নরম এবং কোমল ভাষায় কথা বলা তাদের নিরাপত্তা এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে সাহায্য করে।

৪. সন্তানের আবেগ নিয়ন্ত্রণ শেখানো

সন্তানদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ শেখানোর ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে ধৈর্য, সহানুভূতি, এবং ভালোবাসার সাথে কাজ করতে হবে।

☑ **রাগ ও হতাশা মোকাবিলায় সহায়তা করা:**

রাগ বা হতাশায় থাকা সন্তানের সাথে শান্ত ও সহানুভূতিশীলভাবে কথা বলে তাদের অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করা। রাগের সময় সন্তানকে নিরাময় করতে পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক উপস্থিতি প্রয়োজন।

☑ **দুঃখ ও কষ্টের মুহূর্তে ধৈর্য শেখানো:**

কোনো দুঃখ বা কষ্টের মুহূর্তে সন্তানকে ধৈর্য ধারণ করতে শেখানো এবং তাদের পাশে থাকা।

☑ **শিশুকে নিজের অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ দেওয়া:**

সন্তানদের নিজের অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ দেওয়া এবং তাদের কথা শুনে সহানুভূতির সাথে প্রতিক্রিয়া জানানো।

৫. আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সন্তানের সাথে সুসম্পর্ক গড়া

আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে পিতা-মাতা সন্তানের সাথে এক দৃঢ় সম্পর্ক গড়তে পারে।

☑ **শাস্তি নয়, বোঝানোর কৌশল অবলম্বন করা:**

সন্তানদের শাস্তি না দিয়ে তাদের সাথে বোঝানোর মাধ্যমে শিখানো। শিশুকে তাদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা করলে তার মানসিকতা ও আবেগে তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

☑ **ভালোবাসা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা:**

সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুললে তারা তাদের আবেগ ও অনুভূতি পিতা-মাতার কাছে প্রকাশ করতে পারে। এটি তাদের আত্মবিশ্বাস এবং আবেগীয় উন্নতির জন্য সহায়ক।

☑ **সন্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া:**

সন্তানের সঙ্গে সমবেদনা এবং সহানুভূতির সম্পর্ক গড়ে তোলা তাদের আবেগীয় সঠিক বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৬. আধুনিক যুগে আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার চ্যালেঞ্জ

আজকের যুগে আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা অর্জন এবং সন্তানের আবেগীয় অবস্থা বুঝতে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তবে, এগুলো মোকাবিলা করা সম্ভব।

☑ **প্রযুক্তির কারণে পারিবারিক সংযোগ কমে যাওয়া:**

বেশিরভাগ সময় প্রযুক্তির প্রতি আসক্তি কারণে পিতা-মাতা এবং সন্তানের মধ্যে যোগাযোগ

কমে যাচ্ছে। পরিবারে সংযোগ এবং আবেগীয় সমঝোতা বাড়ানোর জন্য মনোযোগি হতে হবে।

☑ **ইন্টারনেটের নেতিবাচক প্রভাব থেকে বাঁচানো:**

ইন্টারনেটের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাদের সঠিক ব্যবহারের সময় এবং পরিমাণ নির্ধারণ করা জরুরি।

☑ **সন্তানের মানসিক চাপ কমানোর উপায়:**

সন্তানের ওপর চাপ কমানোর জন্য পিতা-মাতাকে তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, এবং তাদের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

৭.আধুনিক যুগের আবেগিও বুদ্ধিমত্তার কিছু টিপস

শিশুর শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা গঠনে পিতামাতার ভূমিকা

অনেক সময় দেখা যায়, শিশুরা ঘরের ভেতর নিয়ন্ত্রণহীন আচরণ করে এবং ইচ্ছেমতো যা খুশি তাই করে। এর মূল কারণ হতে পারে, পিতা-মাতা কখনোই ঘরে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেননি। শিশুদের সুশৃঙ্খলভাবে বড় করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা অত্যন্ত জরুরি। এটি তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

আজ আমরা তিন ধরনের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব, যা শিশুদের ঘরে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করবে, ইন শা আল্লাহ।

১. নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়ম

শিশুদের নিরাপদ রাখতে এবং দুর্ঘটনা এড়াতে কিছু নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়ম নির্ধারণ করা জরুরি।

☑ বাড়ির দরজা না খোলা:

শিশুকে বোঝাতে হবে যে, পরিবারের বড় কেউ উপস্থিত না থাকলে দরজা খোলা যাবে না। এতে অপরিচিত কেউ প্রবেশের সুযোগ পাবে না এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

☑ ফার্নিচারে লাফালাফি না করা:

বাচ্চারা অনেক সময় টেবিল, চেয়ার বা খাটে লাফালাফি করে, যা বিপজ্জনক হতে পারে। এটি থেকে বিরত রাখতে হবে, যাতে তারা দুর্ঘটনার শিকার না হয়।

২. আচরণগত নিয়ম

শিশুর সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ গঠনে কিছু নৈতিক আচরণগত নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন।

☑ অশোভন শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ:

শিশুকে শেখাতে হবে, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কখনোই খারাপ ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। এটি ভদ্র আচরণের অভ্যাস গড়ে তোলে।

☑ মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ:

শিশুকে সত্য কথা বলার শিক্ষা দিতে হবে। কোনো সদস্য মিথ্যা বললে, তার জন্য একটি শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে (যা শারীরিক শাস্তি নয়)। সততা গড়ে তোলার জন্য এটি জরুরি।

☑ মারামারি না করা:

ভাই-বোনদের মধ্যে মারামারি বা ঝগড়া হলে, তাদের মাফ চাইতে বাধ্য করতে হবে। এতে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্পর্ক মজবুত হয়।

☑ ক্ষমা চাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা:

শিশু কোনো ভুল করলে, তাকে "দুঃখিত" বলা শেখাতে হবে। একইভাবে, অভিভাবকদেরও ভুল করলে ক্ষমা চাওয়ার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে, যাতে শিশু তা শিখতে পারে।

৩. স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার নিয়ম

শিশুর স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন।

☑ ঘুমানোর আগে দাঁত ব্রাশ করা:

শিশুকে শেখাতে হবে, রাতে ঘুমানোর আগে দাঁত ব্রাশ করা বাধ্যতামূলক। এটি দাঁতের ক্ষয় রোধ করে এবং স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

☑ স্ন্যাকস কম খাওয়া:

সন্ধ্যার খাবারের আগে অতিরিক্ত স্ন্যাকস বা চিনিযুক্ত খাবার খাওয়া বন্ধ করতে হবে, যাতে শিশুর ক্ষুধা ও খাওয়ার রুটিন ঠিক থাকে।

☑ জাঙ্ক ফুড পরিহার:
চিপস, ফাস্ট ফুড বা কোলা জাতীয় খাবার বাড়িতে না রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়, যাতে শিশুরা পুষ্টিকর খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়।

☑ পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তোলা:
শিশুকে শেখাতে হবে, ময়লা জামাকাপড় যথাস্থানে (যেমন কাপড় রাখার ঝুড়িতে) রাখতে হবে। এতে তারা দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে।

পরিবারের নিয়ম কীভাবে কার্যকর করবেন?
☑ ১. নিয়মগুলোর গুরুত্ব বুঝিয়ে দিন:
শিশুর সঙ্গে নিয়মগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। তাকে বোঝান যে, এগুলো মেনে চললে সে কিভাবে উপকৃত হবে।

☑ ২. ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দিন:
শিশু যখন নিয়ম মেনে চলে, তখন তাকে প্রশংসা করুন বা ছোটখাটো পুরস্কার দিন। এতে সে নিয়ম মেনে চলতে উৎসাহিত হবে।

☑ ৩. নিয়ম ভাঙার পরিণতি নির্ধারণ করুন:
শিশুকে আগেই জানিয়ে দিন, কোনো নিয়ম ভাঙলে কী ধরনের শাস্তি হতে পারে। তবে শাস্তি যেন গঠনমূলক হয়, শারীরিক নয়।

৪.শিশুর সম্মানবোধ গড়ে তোলা
একটি শিশুর আচরণ তার চারপাশের পরিবেশ ও পরিবারে তার প্রতি যে আচরণ করা হয়, তার ওপর নির্ভর করে। শিশুরা যা দেখে, সেটাই অনুকরণ করে। বিশেষ করে, বাবা-মায়ের আচরণ তাদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

বাবা-মায়ের পারস্পরিক সম্মান:
যদি বাবা-মা একে অপরকে সম্মান না করেন, তাহলে শিশুরাও বড়দের সম্মান করতে শিখবে না। যেমন, যদি বাবা মাকে অসম্মান করেন, চিৎকার করেন বা অবজ্ঞা করেন, তাহলে সন্তানও একই আচরণ অনুকরণ করবে।

○ করণীয়:

বাবা-মাকে একে অপরকে সম্মান করতে হবে, বিশেষ করে সন্তানের সামনে।
পারিবারিক পরিবেশে ভদ্র ভাষা ব্যবহার করতে হবে।
শিশুকে দেখাতে হবে, বড়দের সম্মান করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।
শিশুর শৃঙ্খলা ও নৈতিক শিক্ষা গড়ে তুলতে ঘরের পরিবেশ ও নিয়ম-কানুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন তৈরি করে তা মেনে চলতে উৎসাহিত করা শিশুর মানসিক ও নৈতিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। অভিভাবকরা যদি সচেতনভাবে এই নিয়মগুলো চালু করতে পারেন, তাহলে শিশুরা আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ, দায়িত্বশীল এবং নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠবে, ইন শা আল্লাহ।
❦ শিশুকে সম্মান ও যত্নশীলতা শেখানো ❦
শিশুকে শেখাতে হবে যে বাবা-মাকে সম্মান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের পরিশ্রম ও ত্যাগের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলুন এবং শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানান।

শিশুর শেখার ধরন
○ যদি বাবা মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, সন্তান সেটিকে স্বাভাবিক মনে করতে পারে। যেমন–
একজন বাবা যদি স্ত্রীর সাথে রূঢ়ভাবে কথা বলেন, সন্তান ভাববে, "বাবা যদি মাকে সম্মান না করেন, তাহলে আমিও করতে হবে না।"

○ যদি বাবা মাকে সাহায্য করেন, যেমন রান্নায় সহায়তা করেন বা ক্লান্ত হলে তাকে বিশ্রাম নিতে বলেন, তাহলে সন্তানও যত্নশীল হওয়ার শিক্ষা পায়। (এই নির্দেশনা বাবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।)

শিশুরা তাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে শেখে। তাই পরিবারের সদস্যদের উচিত একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, যাতে শিশুরাও সেই মূল্যবোধ আয়ত্ত করতে পারে ইন শা আল্লাহ।
❦ নতুন বাবা-মায়ের জন্য চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ❦
জীবনে যখন সবকিছু কঠিন মনে হয়, মনে রাখুন–আপনি যখন সাফল্যের শিখরে পৌঁছাবেন, তখন দৃশ্যটি কতটা সুন্দর হবে! বিশেষ করে নতুন বাবা-মায়ের ক্ষেত্রে এটি খুবই প্রযোজ্য।

৯. নতুন বাবা-মায়ের চ্যালেঞ্জ

☑ যদি শিশু হাই-ডিমান্ডিং হয়:

কিছু শিশু স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মনোযোগ ও যত্ন চায়। যেমন–

- ◇ সবসময় কোলে থাকতে চায়
- ◇ ঘন ঘন কান্না করে
- ◇ সহজে ঘুমায় না

এ ধরনের শিশুকে সামলানো প্রথমদিকে কঠিন মনে হতে পারে, তবে ধৈর্য ও সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে এটি সহজ হয়ে যায়।

☑ শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পর্কে কম ধারণা:

যদি বাবা-মা শিশু লালনপালনের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে না জানেন, তাহলে সন্তানের আচরণগত পরিবর্তন বোঝা কঠিন হয়ে যায়। যেমন–

- ◇ কখন শিশুর দাঁত উঠবে
- ◇ কখন সে কথা বলা শুরু করবে
- ◇ কখন হাঁটতে শিখবে

যদি এসব বিষয়ে ধারণা না থাকে, তাহলে সন্তান লালনপালন অনেক সময় হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

💡 কীভাবে সহজ করা যায়?

✔ শিশুর চাহিদা ও স্বভাব বুঝতে সময় দিন

✔ ধৈর্য ধরে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত থাকুন

✔ প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন

সফল পিতৃত্ব-মাতৃত্ব একদিনে সম্ভব নয়, তবে প্রতিটি ছোট পদক্ষেপ আপনাকে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ! ✿

✹ ধৈর্য ও জ্ঞানের শক্তি: সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠনের সোপান ✹

ভাবুন, আপনি পাহাড় চড়ছেন। প্রথমে ক্লান্ত লাগবে, পা ব্যথা করবে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হবে। কিন্তু যদি মাঝপথে হাল ছেড়ে দেন, তাহলে কখনো শিখরে পৌঁছাতে পারবেন না। কিন্তু যদি পাহাড় সম্পর্কে ধারণা নিয়ে, পরিকল্পনা করে এগোন, তাহলে শিখরে ওঠা সম্ভব। একইভাবে, সন্তানের লালন-পালনও একটি ধাপে ধাপে শেখার ও ধৈর্যের যাত্রা। যদি আপনি সময় দেন, সঠিক জ্ঞান অর্জন করেন, তাহলে কঠিন হলেও আপনি সফলভাবে একজন আদর্শ সন্তান গড়ে তুলতে পারবেন।

১০."Golden Age" কেন গুরুত্বপূর্ণ?

শিশুর প্রথম ৫ বছর তার ভবিষ্যতের ভিত্তি তৈরি করে। এই সময় যদি তাকে সঠিক শিক্ষা, ভালোবাসা ও শৃঙ্খলা দেওয়া যায়, তাহলে সে–

- ✔ আত্মবিশ্বাসী
- ✔ মেধাবী
- ✔ সমস্যার সমাধানকারী
- ✔ ভালো আচরণসম্পন্ন একজন আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে।

একটি শিশুর প্রথম ৫ বছর তার ভবিষ্যতের ভিত্তি তৈরি করে। ঠিক যেমন একটি গাছের শিকড় শক্ত হলে সেটি বড় হয়ে মজবুত হয়, তেমনি এই ৫ বছরে শিশুর মানসিকতা, আচার-আচরণ, আত্মবিশ্বাস, ও শেখার ক্ষমতা গড়ে ওঠে।

যদি এই সময় তাকে ভালোবাসা, শৃঙ্খলা ও সঠিক শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে বড় হয়ে সে:

- ☑ আত্মবিশ্বাসী হবে
- ☑ বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে
- ☑ সমস্যার সমাধান খুঁজতে পারবে
- ☑ ভদ্র, বিনয়ী ও আদর্শ মানুষ হয়ে উঠবে।

তাই, বাবা-মা হিসেবে এই সময়টাকে গুরুত্ব সহকারে নিন।

কীভাবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবেন?

☑ শিশুর আচরণ বুঝতে শিখুন। অনেক সময় শিশুর কান্না বা চিৎকার আমাদের বিরক্ত করতে পারে, কিন্তু আসলে সে হয়তো কিছু বোঝাতে চাইছে। তাকে সময় দিন, ধৈর্য ধরুন।

☑ তার আবেগ ও চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হন। বাচ্চারা কথা বলতে পারে না বলে তাদের অনুভূতি বোঝানো কঠিন হয়। চেষ্টা করুন তার চোখের ভাষা ও আচরণের মাধ্যমে তার চাহিদা বুঝতে।

☑ ধৈর্য ধরুন, দু'আ করুন। বাবা-মা হওয়া সহজ নয়, কিন্তু আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে সব সহজ হয়ে যায়।

☑ সঠিক অভ্যাস ও নিয়ম গড়ে তুলুন।

রাতে ঘুমানোর নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করুন।

খাবারের সময় নির্দিষ্ট রাখুন।

তার সামনে ভালো আচরণ করুন, কারণ সে আপনাকে অনুকরণ করবে।

☑ নিজেকে শিক্ষিত করুন। শিশুর বৃদ্ধি, ঘুম, খাওয়ার অভ্যাস ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনা করুন। অভিজ্ঞ বাবা-মায়ের পরামর্শ নিন।
য়েকটি কারণ থাকতে পারে:

১.তারা হাতের ব্যবহার সম্পর্কে ভুল ধারণা পায় ধরুন, কেউ শিশুকে আনন্দের ছলে তার গালে চিমটি কাটলো বা মাথায় টোকা দিলো। এতে সে ভাবতে পারে, "ওহ! হাত দিয়ে কাউকে স্পর্শ মানেই চিমটি কাটা বা ধাক্কা দেওয়া! পরবর্তীতে, সেও অন্যদের গালে চিমটি কাটা বা ধাক্কা দেওয়া শুরু করে।

☑ সমাধান: শুরু থেকেই তাকে শেখান, "হাত দিয়ে আমরা আদর করি, কিছু ধরি, খাবার খাই, আঁকি, লিখি। তাকে ইতিবাচকভাবে হাতের ব্যবহার শেখান।

২. বড়দের ভুল প্রতিক্রিয়া শিশুটি খেলনা ছুড়ে দিলো, মা-বাবা হেসে বললেন, "আহা! তুমি তো বেশ শক্তিশালী!"এতে শিশুর মনে হলো, "আমি যদি জিনিস ছুঁড়ি, সবাই হাসে, খুশি হয়! তাহলে আমি এটা চালিয়ে যাবো।"

☑ সমাধান: যখন শিশু কিছু ছুঁড়ে ফেলে, তখন হাসার বদলে শান্তভাবে বলুন, "এভাবে ছুড়ো না, এটা হাতে ধরো বা কাউকে দিয়ে দাও।"

৩. শিশুর বিকাশের অংশ হিসেবে কিছু ফেলা বা ছোঁড়া শিশু যখন খাবারের প্লেট উল্টে দেয়, পানি ফেলে দেয়, তখন সে আসলে বোঝার চেষ্টা করছে, "এই জিনিসগুলো কীভাবে কাজ করে?"

সে দেখতে চায়, "আমি যদি খেলনাটি ছুঁড়ে দিই, এটি কোথায় গিয়ে পড়ে?"

☑ সমাধান: শিশুকে শেখান, "তুমি যদি কিছু ফেলতে চাও, তবে সেটা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলো" (যেমন, খেলনা বাক্সে)।

শিশুকে কীভাবে হাত ও শরীরের সঠিক ব্যবহার শেখাবেন?

☑ ১. ছোট থেকেই শরীরের অংশের নাম শেখান

· শিশুকে বলুন, "এটা তোমার হাত, হাত দিয়ে আমরা আদর করি, আঁকি, বই ধরি।"

· চোখ, কান, নাক, পা সবকিছুর নাম শেখান এবং সেগুলোর কাজ সম্পর্কে বলুন।

☑ ২. ভালো আচরণের অনুশীলন করান

· শিশুর হাতে নরম কিছু দিন এবং বলুন, "তুমি হাত দিয়ে এটা আদর করো।"

· সে যদি কাউকে মারে, তখন বলুন, "হাত দিয়ে আমরা মারি না, আমরা আদর করি।"

☑ ৩. ভালো আচরণের প্রশংসা করুন

· যখন শিশু হাত দিয়ে ভালো কিছু করে, যেমন কারো গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, তখন বলুন, "তুমি খুব ভালো কাজ করেছো!"

· এতে শিশুর মনে হবে, "আমার হাত দিয়ে ভালো কাজ করলে মা-বাবা খুশি হন।"

☑ ৪. খেলার মাধ্যমে শেখান

· বলুন, "চলো, আমরা হাত দিয়ে ছবি আঁকি।"

· "চলো, আমরা হাত দিয়ে খেলনা সুন্দর করে রাখি।"

শিশুরা শেখার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়, এবং কখনো কখনো তাদের আচরণ আমাদের জন্য অস্বস্তিকর হতে পারে। কিন্তু ধৈর্য ধরে, ইতিবাচকভাবে দিকনির্দেশনা দিলে তারা সঠিক আচরণ শিখবে।

আপনার শিশু যদি জিনিস ছোঁড়ে বা কাউকে মারে, তবে রাগ না করে তাকে ধৈর্যের সঙ্গে বোঝান। একদিন সে নিজেই বুঝতে শিখবে, "আমার হাত দিয়ে আমি ভালো কাজ করবো! আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা সন্তানের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামে আবেগ নিয়ন্ত্রণের উপদেশ রয়েছে, এবং রাসূল (সা.) ও সাহাবাদের জীবন থেকে আমরা আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা চর্চা করতে শিখতে পারি। আধুনিক যুগে প্রযুক্তির প্রভাব বাড়লেও, পিতা-মাতাদের দায়িত্ব হলো সন্তানের আবেগীয় উন্নতির জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

اللهم اجعلنا من الآباء والأمهات الذين يربون أولادهم على الذكاء العاطفي ويراعون مشاعرهم. آمين.

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন পিতা-মাতা বানাও যারা তাদের সন্তানদের আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা শেখাবে এবং তাদের অনুভূতিগুলির প্রতি সম্মান দেখাবে। আমীন।"

একথা মাথায় থাকে যে, সন্তান আল্লাহর আমানত মাত্র। প্রতিপালনের স্বার্থে কয়েকদিনের জন্য তারা আমাদের কাছে আছে, তাহলে কখনো তাদের ইন্তিকাল হলে বেশি আফসুস হবে না। কেননা আফসোসের মূল কারণ হল, সন্তানকে নিজের বস্তু মনে করা। (ফাযায়েলে সবর ও শোকর-৬৩৯)

নিঃসন্তান ও সন্তান মারা যাওয়ার ফজিলত

১.নিঃসন্তানদের জন্য চমৎকার সান্ত্বনা

আমার উস্তাদ মাওলানা সাইয়্যেদ আহমাদ দেহলভী সাহেবের মামা মাওলানা সাইয়্যেদ মাহবুব আলী সাহবের কোন সন্তান ছিল না। একদিন তিনি চিন্তিত অবস্থায় বসা ছিলেন। আমার উস্তাদ তখন বালক ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, মামা! পেরেশান কেন? তিনি জবাবে বলেন, আমার দুঃখ হল আমি বুড়ো হতে গেলাম অথচ এখনও আমার কোন সন্তান হল না। আমার উস্তাদ কম বয়সী থাকলেও তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ! এটা খুশির কথা নাকি চিন্তার বিষয়? তিনি জানতে চান, নিঃসন্তান হওয়া কীভাবে খুশির বিষয় হতে পারে? উস্তাদ বলে, এটা কি খুশির কথা নয় যে, আপনি হলেন আপনার বংশের উদ্দীষ্ট পুরুষ। আর আপনার বংশের পূর্ববর্তী পুরষেরা হল আপনার আগমনের অসিলা। আপনি আসবেন বলেই পর্যায়ক্রমে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে উদাহরণ দিয়ে বুঝাই। গম দু' ধরণের হয়। এক ধরনের থাকে যেগুলো খাওয়ার জন্য রাখা হয়। আরেক ধরনের গম থাকে যেগুলো 'বীজ' হিসাবে রাখা হয়। এ দুই প্রকার গমের মধ্যে উৎপাদনের সময় মূল লক্ষ্য থাকে ঐ গম, যা খাওয়ার জন্য রাখা হয়। অর্থাৎ মানুষ গমের চাষ করে মূলত খাদ্যের জন্য। আর যে গম 'বীজ' হিসেবে রাখা হয় তা উৎপাদনের মূল লক্ষ্য থাকে না। বরং এটা হয় মূল লক্ষ্য অর্জনের উপায় মাত্র।

এমনিভাবে যার সন্তান হয় না, হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত চলমান বংশধারার মধ্যে সেই একমাত্র উদ্দীষ্ট পুরুষ। পূর্বসূরীরা হল তার অসিলা মাত্র। পক্ষান্তরে যার সন্তান হয়, সে নিজে উদ্দীষ্ট হয় না; বরং সে হল 'বীজের' মত। যারা নিঃসন্তান হওয়ায় ভারাক্রান্ত, তাদের জন্য এ আলোচনায় সান্ত্বনার রসদ রয়েছে। যদি এতেও আক্ষেপ দূর না হয়, তাহলে দুনিয়ার বাস্তব অবস্থা দেখে সান্ত্বনা লাভ করা উচিত। কেননা, দুনিয়ার সাধারণ চিত্র হল, যাদের সন্তান রয়েছে তারা অনেক ঝামেলার মধ্যে আছে। এতেও মন না মানলে এ কথা চিন্তা করবে যে, আল্লাহর ফায়সালার মধ্যেই আমার কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ জানেন, সন্তান হলে ভাল হত কী মন্দ। এতেও মন প্রশান্ত না হলে, সন্তান না হওয়ার জন্য অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে দায়ী করবে না।

(হুকুকুয যাওযাইন-৩৮)

২ .মৃত সন্তানদের মরে যাওয়ার মধ্যেই কল্যাণ ছিল

হযরত খিযির (আ.) ও হযরত মূসা (আ.)-এর প্রসিদ্ধ ঘটনা কুরআনে উল্লেখিত আছে। হযরত খিযির (আ.) একটি বালককে হত্যা করলে হযরত মূসা (আ.) বলেন, আপনার কাজটি মোটেও ঠিক হয় নি। এক নিরাপরাধ বালককে আপনি হত্যা করলেন। হযরত খিযির (আ.) পূর্ব হতেই হযরত মূসা (আ.)-কে সাথে থাকার এই শর্ত দিয়েছেলেন যে, আমার কোন কাজে আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে না। এ জন্য হযরত খিযির (আ.) হযরত মূসা (আ.)- কে স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমি না পূর্বেই তোমাকে বলেছিলাম যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না।

পরে হযরত খিযির (আ.) হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর উক্ত বালক হত্যার কারণ এই বলে ব্যাখ্যা করেন যে, বালকটির পিতামাতা মুসলমান। অথচ বালকটি বড় হলে কাফির হত আর সন্তানের টানে পিতামাতাও কাফির হয়ে যেত। তাই, আল্লাহ চান যে, বড় হওয়ার আগেই সে মারা যাক এবং তার পরিবর্তে তার পিতামাতা নেক সন্তান লাভ করুক।

এ ঘটনা দ্বারা জানা যায় যে, যে বাচ্চা শৈশবে মারা যায়, তার মরে যাওয়াটাই ভাল। এ কারণে যারা দ্বীনদার তারা সন্তান মারা গেলে ব্যথিত হলেও মুষড়ে পড়েন না, অস্থির হন না। যারা আল্লাহ তা'আলাকে হাকীম 'প্রজ্ঞাময় ও বিচক্ষণ' বলে বিশ্বাস করে, তারা কোন ঘটনায় ভেঙ্গে পড়েন না। যার মাথায় এ বিষয়টি থাকে না, তারা কোন বিপদ হলে বিশেষত সন্তান মারা গেলে একেবারে মুষড়ে পড়েন। জীবিত থাকলেও বুকের মধ্যে শোকের আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। হা-হুতাশ করে। আক্ষেপ হয়। মরা সন্তানের স্মৃতিকথা স্মরণ করে শোকে পাথর হয়। কোনক্রমেই সন্তানের অকাল মৃত্যু মেনে নিতে পারে না।

প্রিয় সূধী! কলিজার টুকরা সন্তান চোখের সামনে মারা গেলে অন্তরে ব্যথা লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে শোকে কাতর হওয়া যাবে না। অকল্যাণ মনে করা ঠিক হবে না। কেননা কিসে কল্যাণ আর কিসে অকল্যাণ তা মানুষ চূড়ান্তভাবে বলতে পারে না। তাই এই মনে করে ধৈর্য ধরতে হবে যে, আল্লাহপাক প্রজ্ঞাময়; তিনি যা করেছেন তার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, এই সন্তান বড় হয়ে কাফির হত এবং আপনাদেরও কাফির বানাত। (দুনিয়া ও আখিরাত-৯৯)

৩.বাচ্চা মারা যাওয়ার লাভ ও তাৎপর্য

ছোট বাচ্চা মারা যাওয়ার মধ্যে বিরাট তাৎপর্য রয়েছে। এগুলো সামনে থাকলে বাচ্চা মারা গেলে দুঃখ হলেও কিছুটা খুশিও লাগবে।

সন্তান বড় হলে মানুষের খুশি শুধু এই কারণে লাগে যে, তার মন এমনটিই চায় যে, সন্তান বড় হোক। নতুবা তাদের জানা থাকে না যে, সে বড় হয়ে কেমন হবে। পিতামাতার শান্তির কারণ হবে নাকি দুঃখ-বিপদের কাল হবে। যদি বড় হয়ে মরে, তাহলে এর কোন নিশ্চয়তা নেই যে, আখিরাতে সে পিতামাতার উপকারে আসবে নাকি নিজেই সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে। পক্ষান্তরে সন্তান শৈশবে মারা গেলে তা খুবই উপকারী। তার ক্ষেত্রে এ ধরনের শংকা থাকে না যে, আখিরাতে তার অবস্থা কী হবে। কারণ বাচ্চা শরীয়ত আদিষ্ট না হওয়ায় নিশ্চিত ক্ষমাপ্রাপ্ত। শুধু তাই নয়; বরং তার ক্ষমা লাভের সাথে সাথে সে পিতামাতার নাজাতেরও বড় কারণ হবে।

হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, বাচ্চারা জান্নাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আখিরাতেও বাচ্চা থাকবে। তাদের আচার-আচরণও বাচ্চাসুলভ হবে। আর তা হল, জিদ ধরা, যা চায় তাই করা, কিছু দেখলে তা নিতে বায়না ধরে। তবে এগুলো জান্নাতে যাবার পূর্বে হবে। জান্নাতে যাবার পর পিতা-পুত্র সবাই এক বয়সের ও এরকই ধরনের উঁচু-লম্বা হয়ে যাবে।

হাদীসে এসেছে, কিয়ামতে যখন আল্লাহ কোন বাচ্চাকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দিবেন, তখন সে বাচ্চাসুলভ আড়ি ধরবে। আল্লাহকে বলবে, পিতামাতা ছাড়া আমি জান্নাতে যাব না। তাদের সাথে নিয়েই তবে জান্নাতে যাব। তখন আল্লাহ বলবেনঃ

أَيُّهَا الطِفْلُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ ادْخِلْ أَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ -

হে জিদী বাচ্চা! আল্লাহর সাথে জিদকারী! তুমি তোমার পিতামাতাকেও জান্নাতে নিয়ে যাও।

তখন বাচ্চা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে পিতামাতাকে সঙ্গে নিয়ে জান্নাতে যাবে। এই হল, বাচ্চা মারা যাবার সবচেয়ে বড় ফায়দা।

পক্ষান্তরে বাচ্চা যদি একটু বড় হয়ে মারা যায়, তাহলে হযরত খিযির (আ.)-এর ঘটনা স্মরণ করে এই সান্ত্বনা গ্রহণ করতে হবে যে, নিশ্চয় এর মধ্যেই আমার কল্যাণ নিহিত। কেননা, হতে পারে, সে জীবিত থাকলে দ্বীনের ক্ষতি করত। আমার দুনিয়া-আখিরাত ক্ষতিগ্রস্থ হত।

এর পাশাপাশি হাদীসে বিপদে ধৈর্য ধরার যে বিস্তারিত আলোচনা এবং ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, তা সামনে রাখলে ইন্‌শাআল্লাহ দুঃখ-বেদনা অনেকটা হ্রাস পাবে।

সারকথা হল, আল্লাহ যাকে সন্তান দেন, তার জন্য সেটাই ভাল আর যাকে নিঃসন্তান রাখেন তার জন্যও সেটাই ভাল। যার সন্তান হয় না, সে এটা ভাববে যে, এর মধ্যেই আমার কল্যাণ রয়েছে। কেননা, সন্তান হলে নানা ঝামেলা পোহাতে হত।

আর যাকে সন্তান দিয়ে আবার তুলে নেন, তার জন্যে এর মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। হাদীসে বিপদগ্রস্তের সান্ত্বনার জন্য যে لِلّٰہِ مَا اَخَذَ وَاَعْطٰی বাক্য এসেছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই। বিপদে পড়ার দু'আ إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ এ মধ্যেও ধৈর্যাবলম্বনের বড় পাথেয় আছে। এর ভিত্তিতেই মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) পূর্ণাঙ্গ সবর করেন এবং স্বামকেও ধৈর্যশীল বানান, যার ঘটনা সামনে আসবে। (ফাযায়েলে সবর ও শোকর: ৬৩৫-৬৩৭)

৪ .ছোট বাচ্চা মারা যাওয়ার ফযীলত

হাদীসে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে লোকের তিনটি বাচ্চা মারা যায়, তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক হবে। এক সাহাবী জানতে চাইলেন, কারো দু'টি বাচ্চা মারা গেলে তার কী হবে? নবীজী হল তারও সওয়াব এরূপ। আরেকজন জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কারো যদি মাত্র একটি বাচ্চা মারা যায় তার কী হবে? তিনি জবাবে বলেন, সেও এমন ফযীলত পাবে। আরেক সাহাবী প্রশ্ন করেন, কারো যদি একট বাচ্চাও না মারা যায় তাহলে তার কী হবে? তখন নবীজী বলেন:

انَا فَرْطُ لِأُمَّتِي وَلَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي

আমি আমার উম্মতের আগে গিয়ে মুক্তির ব্যবস্থা করব। আমার মৃত্যুতে উম্মত যেমন শোকাহত হবে এমনটি আর কারো জন্য হবে না।

এই কারণে তাদের জন্য আমার ইন্তিকালের আঘাতই ক্ষমার জন্য যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ আমি দুনিয়া হতে আগে গিয়ে উম্মতের ক্ষমার জন্য চেষ্টা-তদবির করব।

কেউ হয়ত বলতে পারে যে, নিঃসন্তানদের জন্য যেমন নবীজীর ইন্তিকালের আঘাতই যথেষ্ট, তেমনি যাদের সন্তান আছে তাদের জন্যও তো যথেষ্ট। তাহলে আবার সন্তানের সুপারিশের প্রয়োজন কী?

এর জবাব হল, আমাদের অতিরিক্ত সান্ত্বনা ও আত্মতৃপ্তির জন্য সন্তানের সুপারিশেরও প্রয়োজন ছিল দু' কারণে। (১) নবীজী সুপারিশ করবেন আদব ও ভীতি সহকারে। পক্ষান্তরে বাচ্চা সুপারিশ করবে জিদ ধরে। বাচ্চারা দুনিয়াতে পিতামাতার কাছে যেভাবে জিদ ধরে তেমনি কিয়ামতে আল্লাহর সাথেও জিদ ধরবে এবং নানা বায়না করবে।

হাদীসে এসেছে, বাচ্চা জান্নাতের দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে। তাকে বলা হবে, ভেতরে যাও। বলবে, যাব না। জিজ্ঞাসা করা হবে, কেন যাবে না? বলবে, পিতামাতাকে সাথে না নিয়ে আমি জান্নাতে যাব না। তখন আল্লাহ তার জিদ দেখে বলবেন:

- أَيُّهَا الطِفْلُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ أَدْخِلْ أَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ

হে জিদী বাচ্চা! আল্লাহর সাথে জিদকারী! পিতামাতাকে সাথে নিয়ে জান্নাতে যাও।

বাচ্চার সুপারিশের দ্বিতীয় কারণ হল, সুপারিশকারীদের সংখ্যা বেড়ে 'সুপারিশ' মজবুত হওয়া। যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে নবীজীর সুপারিশই যথেষ্ট, তথাপি সুপারিশের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে যেহেতু মনে বেশি সান্ত্বনা আসে, তাই বাচ্চাদের সুপারিশও দরকার। (ফাযায়েলে সবর ও শোকর-৩৩১)

হাদীসে আরও এসেছে, কোন মুসলমানের ছোট সন্তান মারা গেলে যখন ফিরিশতারা তার রূহ নিয়ে আসমানে যায় তখন আল্লাহ তাদের লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তান তুলে এনেছ? তারা ইতিবাচক জবাব দিলে আল্লাহ পুনরায় জানতে চান, যার বাচ্চা এনেছ তার অবস্থা কী? তারা জানায়, লোকটি আপনার প্রশংসা করেছে এবং ধৈর্যধারণ করেছে। তখন আল্লাহ বলেন, তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার এই বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। তোমরা তার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরি কর। মহলটির নাম হবে 'বায়তুল হামদ'।

এটা হল ছোট সন্তান মারা যাবার ফযীলত। যার সারকথা হল, বাচ্চা মারা গেলে পিতামাতা যদি ধৈর্যধারণ করে তাহলে তারা উত্তম বদলা পায়। আল্লাহ এ অসিলায় তাদের ক্ষমা করে দেন এবং জান্নাতে তাদের জন্য 'মহল' তৈরি করান। (ফাযায়েলে সবর ও শোকর-৩৩৩)
সন্তান বড় হয়ে মারা যাবার ফযীলত

সন্তান বড় হয়ে মারা গেলে ফযীলত ও সওয়াবের প্রতিশ্রুতি আছে। হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

- مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِى جَزَاءً إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّةَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسِبُهُ إِلَّا الْجَنَّةَ

যখন কোন মুমিন বান্দার প্রিয়জনকে আমি উঠিয়ে নেই আর সে (এ আঘাত পেয়ে সবর করে ও প্রতিদানে) সওয়াবের আশা রাখে, তাহলে তার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতিত কোন পুরস্কার নেই। অর্থাৎ জান্নাত তার জন্য অবধারিত। (বুখারী, মেশকাত-১৫০)

হাদীসে صَفِى শব্দ এসেছে। যার মধ্যে ছোট সন্তান, বড় সন্তান, পিতামাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই শামিল। উদ্দেশ্য হল এটা বলা যে, মানুষের কোন নিকটতম লোক, চাই সে তার যাই হোক না কেন- মারা গেলে সে যদি অধিক বিচলিত ও পেরেশান না হয়ে সবর করে এবং এতে সওয়াবের আশা রাখে তবে তার উক্ত ফযীলত ও মর্যাদা লাভ হবে।

হযরত আব্বাস (রা.) ইন্তিকাল করলে, তাঁর পুত্র ইবনে আব্বাস (রা.) কঠিন আঘাত পান। তখন অনেকেই তাঁকে সান্ত্বনা দেয়। তবে তার মধ্যে এক গ্রাম্য লোকের সান্ত্বনাবাণী ছিল তাৎপর্যময়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, গ্রাম্য লোকটির মত উত্তম সান্ত্বনা আমাকে আর কেউ দিতে পারে নি। লোকটি আমাকে বলেছিল:

اصْبِرْ تَكُنْ بِكَ صَابِرَيْنَ فَإِنَّمَا *صَبْرَاكَ رَعِيَّتُهُ بَعْدَ صَبْرِ الرَّأْسِ

“হে ইবনে আব্বাস! ধৈর্য ধরুন। যাতে আপনার ধৈর্যধারণ দেখে আমরাও ধৈর্যশীল হতে পারি। কেননা আপনার ধৈর্যটা হবে মাথার ধৈর্যধারণের পর বাকী অঙ্গ-প্রতঙ্গেরও ধৈর্যধারণের মত। তার কথার মর্মার্থ হল, হে ইবনে আব্বাস! আপনি জাতির অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। আপনার

কাজ-কর্ম সবাই অনুসরণ করে। তাই এই বিপদে আপনি ধৈর্য ধরলে আপনাকে দেখে আমারও ধৈর্যশীল থাকব। আপনি ধৈর্য না ধরলে সাধারণ মানুষও ধৈর্য ধরবে না।

সুবহানাল্লাহ! লোকটি গ্রাম্য হলেও কত সুন্দর ভাষায় সবর করার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গ্রাম্য লোকটি আরও বলেন:

خَيْرٌ مِنَ الْعَبَّاسِ أَجْرُكَ بَعْدِهِ * وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْكَ لِلْعَبَّاسِ

আপনার জন্য হযরত আব্বাসের জীবিত থাকার চেয়ে ঐ সওয়াব বেশি ভাল যা তার ইন্তিকালে আপনার হাসিল হবে। কেননা, হযরত আব্বাস জীবিত থাকলে আপনার লাভ তো কেবল এটাই যে, তাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাত হবে। অথচ এই সাক্ষাতের লাভের তুলনায় তাঁর মৃত্যুহেতু সওয়াব পাওয়া বেশি লাভজনক। কেননা, সওয়াবের মূলকথা হল আল্লাহর সন্তুষ্টি।

সুতরাং সারকথা এই বের হল যে, হযরত আব্বাসের ইন্তিকালের উপর সবর করায় আপনি যেন আল্লাহকেই পেয়ে গেলেন। আর আল্লাহকে পাওয়া- এটাই সবচেয়ে বড় সফলতা। অনুরূপ হযরত আব্বাসের জন্যও আল্লাহপাক আপনার থেকে বেশী ভাল। কেননা তিনি মরে গিয়ে তাঁর কাছেই পৌঁছে গিয়েছেন। তিনি না মরে বেঁচে থাকলে তাকে দুনিয়াতেই পড়ে থাকতে হত, আল্লাহর দীদার লাভ তাঁর হত না। (ফাযায়েলে সবর ও শোক্‌র- ৩৩৪)

৫ .ধৈর্য ও সান্ত্বনা

কেউ মারা গেলে তার ব্যাপারে এটা ভাবা যে, যদি সে তাড়াতাড়ি না মরে বরং দীর্ঘদিন অসুস্থ থেকে রোগে ভুগে মারা যেত, তাহলে হয়তবা তার প্রতি অনেকের কুধারণা হত অনেকের মনে বিতৃষ্ণা জন্মাতো। আর এতে করে মৃতব্যক্তির ক্ষতি হত। কেননা, যে দীর্ঘদিন ভুগে মরে সে অন্যদেরও চরমভাবে ভোগায়। আর যে ভুগিয়ে মরে সাধারণত মানুষ তাকে কমই স্মরণ করে। তার জন্য সওয়াবের ব্যাবস্থা কম করে। কারণ সওয়াবের ব্যবস্থা তার জন্যই করা হয় যার মৃত্যুতে আঘাত ও শোক লাগে। আর যে ভুগিয়ে মরে তার মৃত্যুটা শোকের হয় না; বরং অনেকের ক্ষেত্রে এই ভেবে খুশিরও কারণ হয় যে, মরেছে খুব ভাল হয়েছে, বেঁচে গেছি। তো যার মৃত্যু এমন স্বস্তিদায়ক

হয়, মানুষ তাকে খুব কমই স্মরণ করে। এজন্য দীর্ঘদিন কষ্টে ভুগে মানুষকে কষ্ট দিয়ে তাদের বিরাগভাজন হয়ে বেঁচে থাকার তুলনায় তাড়াতাড়ি মরে যাওয়া অনেক অনেকগুণ ভাল। এতে আত্মীয়-স্বজনকে যেমন দীর্ঘ কষ্ট পোহাতে হয় না, তেমনি তাদের আন্তরিক দু'আও পাওয়া যায়।

আত্মীয়-স্বজনের জন্যও এটা ভাল যে, তাদের আপনজন প্রিয় অবস্থায় মারা যাবে। এতে উভয় পক্ষের লাভ। কারণ মানুষ তাকেই স্মরণ করে যাকে ভালবাসে, প্রিয় জানে। আর যখন কেউ জানে যে, সে আমাকে ভালবাসে, তখন সেও তার জন্য দু'আ করে।

৬. সন্তানের মৃত্যুতে হযরত উম্মে সুলাইম (রা.)-এর ধৈর্যের অপূর্ব ঘটনা

হযরত উম্মে সুলাইম (রা.)-এর ঘটনা হাদীসে নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে-

তাঁর একটি ছোট সন্তান ছিল। সন্তানটি ছিল অসুস্থ। তাঁর স্বামী হযরত তলহা (রা.) প্রতিদিন কাজ থেকে ফিরে সন্তানের খবারাখবর নিতেন। একদিন বাচ্চাটি ইন্তিকাল করে। সন্ধ্যায় হযরত তলহা (রা.) বাড়ী এলে হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) তাকে সন্তানের ইন্তিকালের খবর জানান না এবং কথাবার্তা ও আচার-আচরণে প্রকাশ হতে দেন না যে, বাচ্চা মারা গেছে। যাতে করে তিনি পরিশ্রান্ত অবস্থায় বাড়ী এসে শান্ত হওয়ার আগেই আবার অস্থির না হন। সন্তান হারার বেদনায় না খেয়ে থাকেন। প্রতিদিনের মত তিনি বাড়ী এসে সন্তানের খবর জানতে চাইলে উম্মে সুলাইম (রা.) বলেন, এখন শান্ত আছে। সন্তান ভাল আছে জেনে তিনি প্রশান্ত মনে খানা খান এবং রাতে স্ত্রীর সাথে মিলিতও হন। স্ত্রী স্বামীর উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করে ধৈর্য ধরেন এবং অন্তর সন্তানের মৃত্যুতে ভারাক্রান্ত হলেও স্বামীর আহ্বানে সাড়া দেন। রাত গিয়ে সকাল হলে তিনি স্বামীকে বলেন, একটি কথা জানতে চাই। আর তা হল, যদি কেউ আমাদের কোন বস্তু আমানত হিসাবে দেয় এবং পরে সে তার আমানত ফেরত চায়, তাহলে আমাদের করণীয় কী? হযরত তলহা (রা.) বলেন, কর্তব্য হল, মালিক তার মাল ফেরৎ চাইলে স্বতস্ফূর্তভাবে তা ফেরৎ দেয়া। হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) বলেন, যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে বাচ্চার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করুন এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করুন। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজের আমানত নিজেই নিয়ে গেছেন।

হযরত তলহা (রা.) রেগে উঠে বলেন, তুমি রাতেই কেন তা জানালে না? স্ত্রী বলেন, জানালে কী হত? রাতে দাফন করতে সমস্যা হত এবং সারা রাত আপনি ব্যথিত থাকতেন। খানা-পিনা গ্রহণ করতেন না। এজন্য রাতে বলি নি।

হযরত তলহা (রা.) নবীজীর দরবারে যান এবং তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। নবীজী বলেন, আল্লাহ উম্মে সুলাইমের কৌশলগত আচরণে খুশি হয়েছেন। আমি আশাবাদী যে, আজ রাতের মিলনে আল্লাহ তোমাদের নেক সন্তান দান করেছেন। পরে এ গর্ভেই হযতর আব্দুল্লাহ বিন তলহা (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। বড় হয়ে তিনি যেমনি বিরাট আলিম হন তেমনি ধন-সম্পদ ও সন্তানাদিরও অধিকারী হয়েছিলেন।

এখানে হযরত উম্মে সুলাইম (রা.)-এর কথাটি সম্পূর্ণ বাস্তব যে, সন্তান আল্লাহর আমানত। তাই যখন তিনি তা নিতে চান, তখন প্রফুল্লচিত্তে তার হাতে সোপর্দ করা উচিত।

কারো মনে প্রশ্ন হতে পারে যে, সন্তান আল্লাহ্ আমানত হয়ে থাকলে তার প্রতি এত মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন কেন? মহব্বত বেশি না হলে চিন্তাও বেশি হত না। এর উত্তর হল, এর অন্যতম কারণ প্রতিপালন। কেননা, মহব্বত ছাড়া তার পেছনে এত শ্রম দেয়া, পায়খানা-পেশাব বরদাশত করা সম্ভব হত না। যেহেতু অন্যের সন্তানের প্রতি এই মহব্বত থাকে না, তাই তাদের প্রতিপালন করাও কষ্টকর হয়। বাচ্চার লালন-পালন যত কমে, তার প্রতি মহব্বত তেমনি কমতে থাকে। এ কারণেই ছোট বাচ্চার প্রতি যেমন মহব্বত হয়, তেমনি বড় সন্তানের প্রতি হয় না।

সারকথা হল, স্বীয় সন্তানকেও আল্লাহর জিনিস মনে করতে হবে। যদি একথা মাথায় থাকে যে, সন্তান আল্লাহর আমানত মাত্র। প্রতিপালনের স্বার্থে কয়েকদিনের জন্য তারা আমাদের কাছে আছে, তাহলে কখনো তাদের ইন্তিকাল হলে বেশি আফসুস হবে না। কেননা আফসোসের মূল কারণ হল, সন্তানকে নিজের বস্তু মনে করা। (ফাযায়েলে সবর ও শোকর-৬৩৯)

উপসংহার

পিতা-মাতার দায়িত্ব শুধু সন্তানের শারীরিক পালন এবং মৌলিক চাহিদা পূরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাদের মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে পিতা-মাতার ভূমিকা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং তাদের দায়িত্ব পূর্ণ করার মাধ্যমে সন্তানের চরিত্র গঠন ও ভবিষ্যত সুস্থ জীবন নিশ্চিত করা যায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবাদের জীবন থেকে আমরা যে দিকনির্দেশনা পেয়েছি, তা পিতা-মাতার দায়িত্ব পালনের পদ্ধতিকে আরও স্পষ্ট এবং কার্যকর করে তোলে। পিতা-মাতাদের উচিত সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি, শাসন ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা এবং সর্বোপরি তাদের জন্য ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করা।

সন্তান সমাজের ভবিষ্যত নির্মাতা। তারা যে শিক্ষা ও মূল্যবোধ পায়, তা তাদের ব্যক্তিগত জীবন뿐 নয়, সমাজের এবং জাতির উন্নতির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা সন্তানের মাঝে গড়ে তোলা তাদের যোগ্য নাগরিক বানানোর প্রক্রিয়া। পিতা-মাতার সঠিক দিকনির্দেশনায়, তারা নৈতিকতা, সৎ চিন্তা এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বশীলতা শিখে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

ইসলামে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সন্তানদের সঠিক শিক্ষা এবং উপদেশ প্রদান, তাদের আবেগের প্রতি মনোযোগ দেওয়া, এবং তাদের নৈতিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ শেখানো ইসলামের প্রধান উদ্দেশ্য। পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সহানুভূতি ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা। ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে সন্তানের চরিত্র গঠন করা, তাদের পবিত্র মূল্যবোধে বলীয়ান করে তুলতে সাহায্য করবে। রাসূল (সা.) বলেছেন, **"তোমাদের মধ্যে সেরা ব্যক্তি সেই, যে তার পরিবার ও সন্তানদের জন্য ভালো।"** *(তিরমিজি, ২৪১)*

ইসলামী নির্দেশনা অনুসরণ করে, পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের নেক এবং সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন, যারা শুধু নিজেদের জীবন নয়, বরং সমাজ ও জাতির কল্যাণে কাজ করবে।

اللهم اجعلنا من الآباء والأمهات الذين يربون أولادهم على الخير والصلاح. آمين.

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন পিতা-মাতা বানাও যারা তাদের সন্তানদের সৎ এবং ভালো পথে গড়ে তুলবে। আমীন।"

কেস স্টাডি

1. **এই ফেমিনিজমের যুগে অনেক নারীরা মনে করেন যে সন্তানের টেক কেয়ার করা, লালন-পালন করার দায়িত্ব শুধুমাত্র মায়ের একার নয় বরং বাবার ও, এক্ষেত্রে এই ধারণাটা কি সঠিক?**
   বাবার উপর ভরন পোষণ ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন দায়িত্ব যেগুলি, এগুলি কি ইহসানের মধ্যে পড়ে নাকি বাবার জন্য ফরজ কাজ বাচ্চার লালন-পালন এবং টেক কেয়ার করা?

জবাবঃ-

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

হাদীস শরীফে এসেছেঃ-

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم :»أَلا كُلُّكُمْ راعٍ وكُلُّكُمْ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وولدِهِ وَهِيَ مسؤولةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مسؤولٌ عَنهُ أَلا فكلُّكُمْ راعٍ وكلكُمْ مسؤولٌ عَن رعيتِه«

’আবদুল্লাহ ইবনু ’উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল, আর (পরকালে) নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদের প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং জনগণের শাসকও একজন দায়িত্বশীল লোক, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আর প্রত্যেক পুরুষ তার পরিবারের একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। আর স্ত্রী তার স্বামীর ঘর-সংসার ও সন্তান-সন্ততির ওপর দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। এমনকি কোনো গোলাম বা চাকর-চাকরাণীও তার মুনীবের ধন-সম্পদের উপর একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেককেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।
(বুখারী ৭১৩৮, মুসলিম ১৮২৯, আবূ দাঊদ ২৯২৮, তিরমিযী ১৭০৫, আহমাদ ৫১৬৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৯২২।)

বিখ্যাত ফিকাহবিদ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন, পুরুষের দায়িত্ব হলো পরিবারকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা। তাদের সব ধরনের অধিকার রক্ষা করা। আর স্ত্রীর দায়িত্ব হলো- ঘরের কাজকর্ম সম্পন্ন করা, সন্তান পরিচর্যা করা, সেবক-সেবিকাদের পরিচালনা করা এবং সব বিষয়ে স্বামীর মঙ্গল কামনা করা। (ফাতহুল বারি : ১৩/১১৩)

আবু উমামাহ (রা.) বলেন, এক নারী তার দুটি সন্তানসহ মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে। সে একটি সন্তানকে কোলে এবং অপরটিকে হাতে ধরে নিয়ে আসে। তখন রাসুল (সা.) বলেন, গর্ভধারিণী, সন্তান জন্মদানকারিণী এবং সন্তানের প্রতি মমতাময়ী তারা যদি স্বামীদের কষ্ট না দেয়, তবে তাদের মধ্যে যারা নামাজি তারা জান্নাতে যাবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২০১৩)

★নাবালক সন্তানাদির লালন-পালনের মূল দায়িত্ব হল স্ত্রীর তথা উক্ত সন্তানের মার।

এসম্পর্কে অন্যতম ফাতাওয়া গ্রন্থ
ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে বর্ণিত আছে.......
أَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الصَّغِيرِ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ الْفُرْقَةِ الْأُمُّ ِ
অর্থাৎ-নাবালক সন্তানাদির লালন-পালনের অগ্রাধিকার ভিত্তেতে হক্কদার মা,চাই (উক্ত সন্তানাদির পিতার সাথে)বর্তমানে বৈবাহিক সম্পর্ক অটুট থাকুক অথবা না থাকুক।

★শিশু সন্তানের পরিচর্যা ও তাদের সঠিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা পিতামাতার দায়িত্ব। বিশেষত আয়-উপার্জন এবং সাংসারিক তাগিদে পিতার অধিকাংশ সময় বাইরে অবস্থানের কারণে সন্তানের প্রায় সবকিছুর ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা বেশি।

সন্তান লালন পালনে মার অগ্রাধিকার থাকলেও এতে মা স্বাধীন, মাকে সন্তান লালন-পালন করতে জোড় করে বাধ্য করা যাবে না,

)وَلَا تُجْبَرُ (مَنْ لَهَا الْحَضَانَةُ)عَلَيْهَا إلَّا إذَا تَعَيَّنَتْ لَهَا (بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْ ثَدْيَ غَيْرِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ وَلَا لِلصَّغِيرِ مَالٌ بِهِ يُفْتَى خَانِيَّةٌ وَسَيَجِيءُ فِي النَّفَقَةِ.
وَإِذَا أَسْقَطَتْ الْأُمُّ حَقَّهَا صَارَتْ كَمَيِّتَةٍ، أَوْ مُتَزَوِّجَةٍ فَتَنْتَقِلُ لِلْجَدَّةِ بَحْرٌ.

অর্থাৎ-হাযিনা (শরয়ী সন্তান লালন-পালনকারী)কে সন্তান লালন-পালন করতে বাধ্য করা যাবেনা, তবে সন্তান অন্য কারো দুধ না খাওয়া ও তার পিতার টাকা না থাকার ধরুণ মার জন্য যদি লালন-পালন করা নির্দিষ্ট হয়ে যায়,তাহলে এক্ষেত্রে মাকে বাধ্য করা যাবে।
এবং যখন মা তার হক্ককে বিসর্জন দিয়ে দিবে তখন মৃতব্যক্তি বা বিবাহিত ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে এবং লালন-পালনের উক্ত দায়িত্ব সন্তানের নানীর কাছে চলে যাবে।আদ্দুররুল মুখতার,৩/৫৫৯;

2. **ছেলে বাচ্চা এবং মেয়ে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর আলাদা আলাদা সময় আছে নাকি দুইক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ সময়সীমা ২ বছর পর্যন্ত?**

আমি শুনছিলাম ছেলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দুবছর আর মেয়ে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আড়াই বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানো যায়।
এটা কি ঠিক?ইসলামে এর বিধান কি?
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ
ইসলামী শরীয়তে শিশুকে চান্দ্রমাসের হিসাবে সর্বোচ্চ দুই বছর (২৪ মাস) পর্যন্ত দুধ পান করানো যাবে। দুই বছরের অধিক দুধ পান করানো যাবে না।

■ আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ الْوَالِدٰتُ یُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ یُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ

মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু বছর দুধ পান করাবে। এ সময়কাল তাদের জন্য, যারা দুধ পান করানোর মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। (সূরা বাকারা ২৩৩)
উক্ত নির্ধারিত সময় পার হবার পরেও কেউ যদি নিজ সন্তানকে দুধ খাওয়ায় তাহলে তা জায়েয হবে না এবং সন্তানের জন্য উপকারী হবে না। কেননা যেটা সন্তানের জন্য উপযোগী সেটাই আল্লাহু তাআলা বিধান দিয়েছো
বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সন্তানকে দুধ পান করানোর মেয়াদ চান্দ্র বছর হিসেবে দুই বছর।
কারন কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, (তরজমা) আর মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে। (এ বিধান) তার জন্য যে দুধ পানের (মেয়াদ) পূর্ণ করতে চায়। -সূরা বাকারা : ২৩৩

আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, আর তার (সন্তান) দুধ ছাড়ানো হয় দু বছরে। -সূরা লুকমান : ১৪

সুতরাং দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পর সন্তানকে আর দুধ পান করানো যাবে না। তাই আড়াই বছর পর্যন্ত পান করানো যাবে- বলে অনেকে যাবে বলে এ কথা ঠিক নয়।

-সূরা বাকারা : ২৩৩; তাফসীরে তবারী ৪৯৬২; মুখতাসারুত তহাবী ২২০; ফাতহুল কাদীর ৩/৩০৯; গুনইয়াতু যাবীল আহকাম শুরুম্বুলালীয়া ১/৩৫৫, ৩৫৬; আলবাহরুর রায়েক ৩/২২৩

■ আলাউদ্দিন হাসক্কাফী রাহ লিখেন,

هُوَ)حَوْلَانِ وَنِصْفٌ عِنْدَهُ وَحَوْلَانِ (فَقَطْ)عِنْدَهُمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ (فَتْحٌ وَبِهِ يُفْتَى كَمَا فِي تَصْحِيحِ الْقُدُورِيِّ عَنْ الْعَوْنِ

শিশুর জন্য মায়ের দুধ পানের সর্বোচ্ছ সময়সীমা-ইমাম আবু-হানিফা রাহ এর মতে আড়াই বৎসর।আর সাহেবাইনের মাযহাব মতে দুই বৎসর।এই দ্বিতীয় মতটাই বিশুদ্ধতম মত।এবং এর উপরই ফাতাওয়া।

আরো বর্ণিত রয়েছে-আহসানুল ফাতাওয়া-৫/১২৮

এ সময়সীমা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই শুরু হবে।

বাচ্ছা দুধ ছাড়তে না চাইলেও তাকে দুধ খাওয়ানো যাবে না।বরং বাচ্ছাকে দুধের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি করে খাদ্যর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

আরো বিস্তারিত জানুন- https://ifatwa.info/6845/

★ সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!

ছেলে বাচ্চা এবং মেয়ে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় সীমা একই রকম অর্থাৎ চন্দ্রমাস হিসেবে সর্বোচ্চ দুই বছর। সুতরাং আপনি যেই কথাটি শুনে ছিলেন অর্থাৎ 'ছেলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দুবছর আর মেয়ে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আড়াই বছর'   তা সঠিক নয়।

তবে যেহেতু আড়াই বছরেরও একটি মত আছে (ছেলে বাচ্চা ও মেয়ে বাচ্চ উভয়ের জন্য)। তাই যদি কঠিন প্রয়োজনে দুই বছর পর দুধ পান করায়,তাহলে আড়াই বছরে আগ পর্যন্ত গুনাহ হবেনা।

উল্লেখিত মাসয়ালায় মতবিরোধ এর কারনে হুকুমের ক্ষেত্রে কিছুটা সহজ এসে যাবে ঠিকই। তবে কোনো ভাবেই আড়াই বছরের পর দুধ পান করানো যাবেনা। এটি হারাম। এতে মায়ের গুনাহ হবে।

তাই সর্বোচ্চ সতর্কতা হলো দুই বছর (২৪ মাস) পর দুধ পান না করানো।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ

ইফতা বিভাগ

Islamic Online Madrasah(IOM

3. **আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লহ,**

১) গর্ভাবস্থায় নেককার ইলমদার আমলদার চক্ষু শীতলকারী অন্তরপ্রশান্তকারী সুসন্তান লাভের জন্য কি আমল ও কি দোয়া করবো?

২) গর্ভাবস্থায় চন্দ্রগ্রহণ/সূর্য গ্রহণ হলে বিভিন্ন নিয়ম মানতে হয়, এগুলো কি সঠিক?

৩) গর্ভাবস্থায় মা যা করে (আমল/গুনাহ) তা কি সন্তানও বড় হয়ে করে?

৪) এক আর্টিকেলে নিচের সুরা আমলগুলো পেলাম, এইরকম মেনে তিলাওয়াত করলে কি বিদআত হবে? বা কি আমল করা যায়?

“অনেক বুজুর্গ এসব সুরা বেশি বেশি পড়তে বলেছেন:-

◆ **প্রথম মাসে- সুরা আল-ইমরান।**

◆ **দ্বিতীয় মাসে-সূরা ইউসুফ।**

◆ **তৃতীয় মাসে-সূরা মারিয়াম।**

◆ **চতুর্থ মাসে-সূরা লোকমান।**

◆ **পঞ্চম মাসে-সূরা মুহাম্মদ।**

◆ **ষষ্ঠ মাসে- সূরা ইয়াসীন।**

◆ **সপ্তম, অষ্টম,নবম ও দশম মাসে-সূরা ইউসুফ, মুহাম্মদ ও ইব্রাহীম।"**

ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

জবাবঃ-

প্রথমেই বলব যে,

নিম্নে বিক্ষিপ্ত কয়েকটির বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করুন।

) : عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمُوا حُبْلاكُمُ اللِّبَانَ؛ فَإِنْ يَكُنْ فِي بَطْنِهَا ذَكَرٌ يَكُنْ ذَكِيَّ الْقَلْبِ ، وَإِنْ تَكُنْ أُنْثَى يَحْسُنُ خُلُقُهَا وَتَعْظُمُ عَجِيزَتَاهَا-)رواه ابو نعيم فيأربعون حديثًا من الجزء الرابع من كتاب الطب - رقم الحديث 38)

রাসূলুল্লাহ বলেন,তোমরা গর্ভবর্তী মহিলাদের দুধ পান করাও।যদি গর্ভে ছেলে সন্তান থাকে তাহলে সে অত্যান্ত বুদ্ধিমান হবে।আর যদি মেয়ে সন্তান থাকে তাহলে তার চরিত্র সুন্দর হবে এবং তার শারিরিক গঠন ও অভয়ব সুন্দর হবে।

এক বর্ণনায় এসেছে,রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন,

তোমরা আতাফল ভক্ষণ করো।এবং পরস্পর হাদিয়া প্রদান করো।এবং তোমাদের গর্ভবর্তী মা'দের কে তা ভক্ষণ করাও।কেননা আতাফল সন্তানাদিগকে সুন্দর করে।

হাজেরা আঃ কে অনুসরণ করে পাহাড় বা এ জাতীয় স্থানে গর্ভবর্তী মায়েদের জন্য কিছু সময় দৌড়ানো উচিৎ।(খাওয়াতিনে ইসলামি ইন্সাইক্লোপিডিয়া:৪০৭)

গর্ভাবস্থায় এবং সন্তান ভূমিষ্ঠের পর খেজুর খাওয়া সাস্থ্যকর।যেমনঃ-

হযরত ঈসা আঃ এর জন্মের পর হযরত মরিয়ম আঃ কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কান্ডে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে।(সূরা মরিয়ম-২৫)

বুজুর্গানে কেরাম বলেন,

গর্ভধারণের সময় কুরআন তেলাওয়াত সহ সকল প্রকার ইবাদত বেশী বেশী করে করলে সন্তান নেককার হয়। যতটুকু সম্ভব বেশী বেশী করে ফরয সহ নফল ইবাদত করলে, এবং নেককার/বুজুর্গানে কেরামদের অভয়বকে কল্পনায় রাখলে সন্তান নেককার হয়।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন-https://www.ifatwa.info/337

সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনী ভাই/বোন!
গর্ভবর্তী মায়েদের জন্য বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াত সন্তান উত্তম চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সমস্ত কুরআন বা প্রশ্নে উল্লেখিত সূরা সমূহ তিলাওয়াত করা যেতে পারে।

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

মুফতী ইমদাদুল হক
ইফতা বিভাগ
Islamic Online Madrasah(IOM)

4. **বর্তমানে বিবাহ পূর্ববর্তী সম্পর্ক অনেক অ্যাভইলএবল। ধরুণ আমার ছেলে এমন একটা মেয়েকে পছন্দ করেছে যার মায়ের সাথে কোনো একসময় আমার অবৈধ সম্পর্ক ছিল, এমতাবস্থায় আমার ছেলে ওই মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে কিনা??**

জবাব

بسم الله الرحمن الرحيم

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বাবার অন্য স্ত্রী (সৎ মা) এর মেয়ে (যেটা অন্য স্বামীর সাথে থাকা অবস্থায় হয়েছিলো) কে বিবাহ করা জায়েজ আছে।

★সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত ছুরতে আপনার ছেলের জন্য উক্ত মহিলার মেয়ের সাথে বিবাহ জায়েজ আছে।

কুরআন শরিফে এরশাদ হয়েছেঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

অর্থাৎ;-তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃ-কন্যা, ভগিনী-কন্যা(ভাগ্নি), তোমাদের সে মাতা,

যারা তোমাদেরকে স্তন্য পান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা(শ্বাশুড়ী), তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা, যারা তোমাদের লালন পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, তোমাদের ঔরষজাত পুত্রদের স্ত্রী, দুই বোনকে বিবাহে একত্রি করণ, কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু।
(সুরা নিসা ২৩)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
অর্থাৎ;-তোমাদের স্বত্বাধীন যেসব দাসী রয়েছে তাদের ছাড়া সকল সধবা নারীকে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এ হল আল্লাহর বিধান। এদের ছাড়া অন্য সকল নারীকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এ শর্তে যে তোমরা তাদের অর্থের বিনিময়ে তলব করবে। ঘর-সংসার করার জন্য, আনন্দ-ফূর্তী করার জন্য নয়। বিয়ের মাধ্যমে তোমরা যে নারীদের সম্ভোগ করবে, তাদের নির্ধারিত মোহর দিয়ে দেবে। আর তোমাদের কোন গোনাহ হবেনা যদি মোহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ হলেন সর্বোজ্ঞ হেকমত ওয়ালা।
(সুরা নিসা)
★★যদিও এই বিবাহ জায়েজ হবে,তবে এই জায়গায় আপনার ছেলেকে বিবাহ করাইলে (যেহেতু তার মায়ের সাথে আপনি যেনা করেছেন,তাই) আবারো সেই যেনা বা তার নিকটবর্তী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে,তাই আল্লাহ তায়ালার বিধান

ولا تقربوا الزني

তোমরা যেনার নিকটবর্তী যেয়োনা,,
এই বিধান মানার স্বার্থে সেই জায়গায় আপনার ছেলেকে বিবাহ না করানোটাই উত্তম।

5. **আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।**
   আমাদের ifatwa সাইটে এ ধরনের বেশ কিছু প্রশ্ন এসেছে যে - বাবা/মাকে না জানিয়ে বিবাহ করলে তা সহী হবে কিনা। উত্তরে সাধারণত বলা হয়েছে যে, প্রাপ্তবয়স্ক পাত্র-পাত্রী যদি সাক্ষী রেখে বিয়ে করে নেয়, তবে কুফু মিললে বিবাহ হয়ে যাবে কিন্তু অভিভাবকে না জানিয়ে বিবাহ করা ঠিক হবে না। কারণ,

অভিভাবক সন্তানের কল্যাণই চায়।
এ প্রেক্ষিতে একজন বোনের প্রশ্নঃ

প্রথমত, অভিভাবক সন্তানের কল্যাণ চাইলেও বর্তমান সময়ে অনেক অভিভাবকই সন্তানের কল্যাণ কীসে তা বোঝে না এবং সে দিকে গুরত্ব দেয় না। দ্বিতীয়ত, সব সন্তান এতটুকু ঈমানদার হয় না যে, নিজেকে বিবাহ থেকে যেমন বিরত রাখবে তেমনই বাহ্যিক-মানসিক সব ধরনের গোনাহ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখবে। ফলে, এমন বাস্তব উদাহরণও দেখতে পেয়েছি যে - সন্তান বিয়ে করতে চেয়েছে অথবা বিয়ের সময় হয়ে গেছে; এবং পরিবারের চেষ্টাহীনতায় সে বিয়ে করেনি কিন্তু পাপ থেকেও নিজেকে বাঁচাতে পারেনি।

যারা বছরের পর বছর নিজেকে অত্যন্ত সংযত রাখছে বাবা-মায়ের কথা মান্য করেই; ফলশ্রুতিতে বিয়ের উপযুক্ত সময় পার করে বিয়ে করছে; তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য যে তারা ইনশাআল্লাহ আল্লাহর কাছে অসীম প্রতিদান পাবে।

আর যারা তাদের ঈমান এতটুকু অর্জন করতে পেরেছে যে, প্রথমত নিজের পদস্খলনের সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে বিয়ে করার চেষ্টা করেছে। তারপর ব্যর্থ হয়েছে। এবং এক সময়ে তার ঈমানী দূর্বলতার কারণে সে সবর করতেও ব্যর্থ হয়েছে এবং পাপে লিপ্ত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারটা কী হবে?

1.প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে কোনটা জরুরী ছিল? বাবা-মার সন্তুষ্টি নাকি গোনাহ থেকে পবিত্রতা? সে যদি গোনাহরত অবস্থায় মারা যায়, তবে সে কোনটার বিনিময় পাবে? বাবা-মার মান্যতার বিনিময় নাকি গোনাহের বিনিময়?

2.দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, কারো পরিবার যদি ঘোষণাই দিয়ে দেয় যে নির্দিষ্ট এত বছর পর তাকে বিবাহ দিবে, তার আগে নয়। সে ক্ষেত্রে কি সে যদি বোঝে এতো বছর অপেক্ষা করা তার জন্য ক্ষতিকর; তবু সে নিজের বুঝটাকে অগ্রাহ্য করবে কিনা? তারপর সে ক্ষতির সম্মুখীন হলে, তার দায়ভার কে বহন করবে?

3.তৃতীয়ত, সাহাবাদের যামানাতে যদি এমন কোন উদাহরণ থেকে থাকে যে কেউ ফেতনার আশংকা করে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু পরিবারের অসম্মতির কারণে সে

বিবাহ থেকে বিরত ছিল; তবে তা সম্পর্কে জানতে চাই।
জাযাকুমুল্লাহু খাইরান এবং সমস্ত ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

জবাবঃ-

(১)

আপনার বর্ণনা,

অভিভাবক সন্তানের কল্যাণ চাইলেও বর্তমান সময়ে অনেক অভিভাবকই সন্তানের কল্যাণ কীসে তা বোঝে না এবং সে দিকে গুরত্ব দেয় না। দ্বিতীয়ত, সব সন্তান এতটুকু ঈমানদার হয় না যে, নিজেকে বিবাহ থেকে যেমন বিরত রাখবে তেমনই বাহ্যিক-মানসিক সব ধরনের গোনাহ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখবে। ফলে, এমন বাস্তব উদাহরণও দেখতে পেয়েছি যে - সন্তান বিয়ে করতে চেয়েছে অথবা বিয়ের সময় হয়ে গেছে; এবং পরিবারের চেষ্টাহীনতায় সে বিয়ে করেনি কিন্তু পাপ থেকেও নিজেকে বাঁচাতে পারেনি।

আর যারা তাদের ঈমান এতটুকু অর্জন করতে পেরেছে যে, প্রথমত নিজের পদস্খলনের সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে বিয়ে করার চেষ্টা করেছে। তারপর ব্যর্থ হয়েছে। এবং এক সময়ে তার ঈমানী দূর্বলতার কারণে সে সবর করতেও ব্যর্থ হয়েছে এবং পাপে লিপ্ত হয়ে গেছে । তাদের ব্যাপারটা কী হবে?

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে কোনটা জরুরী ছিল? বাবা-মার সন্তুষ্টি নাকি গোনাহ থেকে পবিত্রতা? সে যদি গোনাহরত অবস্থায় মারা যায়, তবে সে কোনটার বিনিময় পাবে? বাবা-মার মান্যতার বিনিময় নাকি গোনাহের বিনিময়?

আমরা আপনার উক্ত বর্ণনার বিত্তিতে বলবো,

যদি বিষয়টা এমনই হয়,যেমনটা আপনি বলছেন,তাহলে এমতাবস্থায় মাতাপিতার সন্তুষ্টিকে তালাশ করার কোনো প্রয়োজনিয়তা নাই।বরং এমতাবস্থায় সে বিয়ে করে নিবে।তার জন্য জন্য বিয়ে করে নেয়া তখন ফরয।এবং বিয়ের জন্য চেষ্টা করাও ফরয।তখন গোনাহর সম্ভাবনাকে সামনে রেখে মাতাপিতার আদেশকে মান্য করা জায়েয হবে না।

(২)

কারো পরিবার যদি ঘোষণাই দিয়ে দেয় যে নির্দিষ্ট এত বছর পর তাকে বিবাহ দিবে, তার আগে নয়। সে ক্ষেত্রে এতো বছর অপেক্ষা করা তার জন্য ক্ষতিকর; জানার পরও অপেক্ষা করা তার জন্য জায়েয হবে না।বরং তখন যেকোনো উপায়ে গোনাহ থেকে বাঁচতে তার জন্য বিয়ে করা ফরয।

(৩)
ছাহাবা যুগে এরকম চাকুরীর কোনো চিন্তাভাবনা কারো ছিল না।বরং তখনকার লোকজন ব্যবসা বাণিজ্য ও পশু পালন,এবং কৃষিকাজ করেই সংসার পরিচালনা করতো।তখন যুদ্ধ বিগ্রহের দরুণ প্রত্যেক গোত্র বা কবিলার লোকসংখ্যার বড়ই প্রয়োজন ছিলো।সেজন্য লোকজন নিজ সন্তানাদিকে তারাতারি বিয়ের ব্যবস্থা করে দিতো।তাছাড়া তখনকার সময়ে জৈবিক চাহিদা বাদীর দ্বারাও পূরণ করা সম্ভবপর হতো।
সন্তন বিয়ে করতে চায় কিন্তু মাতাপিতা চায়না,এমন কোনো ঘটনা আপাতত খুজে পাইনি।

6. .প্রিয় শায়েখ,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْــــــــــــــــكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

কোন বাবা মায়ের যদি একটি বা একাধিক মেয়ে থাকে, ছেলে সন্তান না থাকে তাহলে কন্যাদ্বয় এর মাঝে তাদের বাবা মায়ের সম্পত্তি কিভাবে বন্টিত হবে? অনেক জায়গায় শুনি বংশের মেয়ের চাচার ছেলেরা নাকি ওই সম্পদের ভাগ পায়? এ ব্যাপারে আমাদের ইসলাম কি বলে?

ওয়া আলাইকুমুস-সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ-
হযরত আবু উমামা রাযি থেকে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেনঃ
إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হক্বদারকে তার প্রাপ্য হক্ব (নির্ধারণ)করে দিয়েছেন।সুতরাং ওয়ারিছদের জন্য আর কোনো ওসিয়্যাত নেই।

অর্থাৎ-মূত্যুর পরে কাউকে কিছু দানের সিদ্ধান্ত নিলে সেটা ওসিয়ত হয়ে যায়,আর নিজ ওয়ারিছদের মধ্য থেকে কারো জন্য ওসিয়ত করা জায়েয নয়।তবে ওয়ারিছ ব্যতীত অন্য কারো জন্য এক তৃতীয়াংশ মালে ওসিয়ত করা জায়েয আছে।
(সুনানে আবু-দাউদ-২৮৭০,সুনানে তিরমিযি-২১২০,
সুনানে নাসাঈ-৪৬৪১,ইবনে মাজাহ-২৭১৩)

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি থেকে বর্ণিত,
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :»مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেনঃ যে ব্যক্তি তার ওয়ারিছদেরকে মিরাছ প্রদান থেকে পলায়ন করবে(তথা-ওয়ারিছদেরকে মিরাছ থেকে বঞ্চিত করবে)আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাকে জান্নাতের মিরাছ থেকে বঞ্চিত করবেন।
সুনানে ইবনে মাজাহ-২৭০৩
হযরত ইবনে আব্বাস রাযি থেকে বর্ণিত,
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :»لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، إلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ«
রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেনঃ ওয়ারিছদের জন্য কোনো ওসিয়ত নেই,তবে যদি অন্যান্য সমস্ত ওয়ারিছরা রাজি থাকে তাহলে জায়েয আছে।(মিশকাত-৩০৭৪)

পিতা বা মাতার একজন মেয়ে সন্তান হলে,উক্ত
একজন মেয়ে সন্তান পিতা মাতার সম্পত্তি থেকে অর্ধেকের বেশী পায় না।এবং দুইজন হলে সে,দুই তৃতীয়াংশের বেশী পায় না। মেয়ের আপন চাচা জীবিত থাকলে তারাও বাবার সম্পত্তিতে অবশিষ্ট সম্পদ পাবে,যদি চাচারা জীবিত না থাকে,তাহলে চাচার ছেলেরাও পাবে,তবে মায়ের সম্পত্তি থেকে মামারা ভাই হিসেবে পাবে।

7. **আসসালামু আলাইকুম।**
   ১) সাবালেগ ছেলে সন্তানের খরচ বাবা দিতে চাচ্ছে না! এক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দরকার।
   ২) সাবালেগ মেয়ে সন্তানের যদি নিজের খরচ চালানোর সামর্থ্য থাকে, তবে বাবার উপর তার খরচ দেয়া ওয়াজিব থাকবে কি?

৩) বাবা কি তার সাবালেগ ছেলে সন্তান, মেয়ে সন্তানকে নিজের টাকায় বানানো ঘর থেকে বের করে দেবার অধিকার রাখে?

জবাব

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

(০১)
শরীয়তের বিধান হলো বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত ছেলে সন্তানের ভরনপোষণ পিতার উপর ওয়াজিব।

আর মেয়ে সন্তানকে বিবাহ দেওয়ার আগ পর্যন্ত তার ভরনপোষণ পিতার উপর ওয়াজিব।

কিন্তু ছেলে সন্তান বালেগ হওয়ার পরেও যদি কেহ অসুস্থতা,পাগল, ইলমে দ্বীন শিক্ষায় লিপ্ত থাকা ইত্যাদি কারনে যদি সম্পদ উপার্জন না করতে পারে,তাহলেও তার ভরনপোষণ দেওয়াও পিতার উপর ওয়াজিব বা জরুরি।
(নাজমুল ফাতওয়া ৫/২১৫)

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী তে আছে

لما فی الهندية)١/٥٦٣:(طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية لا بالخلافيات الركيكة وهذيان الفلاسفة ولهم رشد وإلا لا تجب كذا في الوجيز للكردري ونفقة الإناث واجبة مطلقا على الآباء ما لم يتزوجن إذا لم يكن لهن مال كذا في الخلاصة ولا يجب على الأب نفقة الذكور الكبار إلا أن الولد يكون عاجزا عن الكسب لزمانة أو مرض ومن يقدر على العمل لكن لا يحسن العمل فهو بمنزلة العاجز كذا في فتاوى قاضي خان

যার সারমর্ম হলো তালেবে ইলেম যখন শতীয়তের জ্ঞান অর্জনে লিপ্ত থাকে,সে যদি সম্পদ উপার্জন না করতে পারে,তাহলে তার ভরনপোষণ দেওয়া পিতার উপর ওয়াজিব।
,,, বালেগ সন্তানের ভরনপোষণ পিতার উপর ওয়াজিব নয়, কিন্তু সে যদি অসুস্থতা, কাজ করতে অক্ষম ইত্যাদি কারনে সম্পদ উপার্জন না করতে পারে,তাহলে তার ভরনপোষণ দেওয়া পিতার উপর জরুরী।

باب وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ وَالْعِيَالِ
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ."تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي .وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي .وَيَقُولُ الاِبْنُ أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .قَالَ لاَ هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

পরিবার-পরিজনের উপর ব্যয় করা ওয়াজিব

৪৯৬৪। উমর ইবনু হাফস (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ উত্তম সাদাকা হল যা দান করার পরেও মানুষ অমুখাপেক্ষী থাকে। উপরের হাত নীচের হাতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। যাদের ভরন-পোষণ তোমার যিম্মায় তাদের আগে দাও। (কেননা) স্ত্রী বলবে, হয় আমাকে খাবার দাও, নতুবা তালাক দাও। গোলাম বলবে, খাবার দাও এবং কাজ করাও। ছেলে বলবে, আমাকে খাবার দাও, আমাকে তুমি কার কাছে রেখে যাচ্ছ? লোকেরা জিজ্ঞাসা করলঃ হে আবূ হুরায়রা আপনি কি এ হাদীস রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ এটি আবূ হুরায়রা জামবিলের নয় (বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে)।

(বুখারী ৪৯৬৪)

,

،حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهْوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ".

৪৯৬০। আদম ইবনু আবূ ইয়াস (রহঃ) ... আবূ মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাবী বলেনঃ আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ এ কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে? তিনি বললেন, (হাঁ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ সাওয়াবের আশায় কোন মুসলমান যখন তার পরিববার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তা তার সাদাকায় পরিগণিত হয়।

(বুখারী ৪৯৬০)

,

অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘মানুষের সর্বোত্তম মুদ্রা সেটি, যা সে তার পরিবারের খরচে ব্যয় করে।’ (মুসলিম : হাদিস ৯৯৪)

,

★সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত ছুরতে সাবালক ছেলেকে অবশ্যই নিজের খরচ এর জন্য কোনো ইনকাম করা উচিত।
এই ছুরতে পিতার উপর তার ভরনপোষণ ওয়াজিব নয়।
তিনি নিজ ইচ্ছায় খরচ দিলে সেটা অনুগ্রহ হবে।
না দিলে কোনো গুনাহ নেই।

,
(০২)
সাবালেগ মেয়ে সন্তানের যদি নিজের খরচ চালানোর সামর্থ্য থাকে, তার পরেও বিবাহের আগ পর্যন্ত বাবার উপর তার ভরনপোষণ এর খরচ দেওয়া ওয়াজিব থাকবে।

,
(০৩)
বাবা তার সাবালেগ ছেলে সন্তান, মেয়ে সন্তানকে নিজের টাকায় বানানো ঘর থেকে বের করে দেবার অধিকার রাখেনা। তাদের কে ত্যাজ্য করারও অধিকার রাখেনা।
এটি জায়েজ নেই।

,
হ্যাঁ যদি এমন গরিব হয় যে কোনোরকমেই থাকার জায়গা না থাকার কারনে পিতা তাদেরকে বাড়িতে রাখতে না পারে,কোনোভাবেই যদি এটি সম্ভব না হয়, তাহলে সাবালক ছেলের থাকার ব্যবস্থা পিতার উপর ওয়াজিব নয়।
তবে মেয়ে সন্তানকে অবশ্যই বিবাহের আগ পর্যন্ত রাখতেই হবে।

৪. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ!

এক বোনের তিনটি ছোট ছোট সন্তান আছে, যাদের বয়স যথাক্রমে ৬, ৩+, ২। পিঠাপিঠি সন্তান হওয়ায় তিনজনেরই দেখাশোনা করতে গিয়ে সবসময়ই মায়ের খুব পেরেশানি হতে থাকে। ওদের নিয়ে ব্যস্ত থেকে উনি স্বামীকেও যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না, সম্ভবত এ কারণেই তাদের সম্পর্কেও ফাটল ধরে গেছে। বর্তমানে আনুমানিক ১ মাস ধরে আবার নতুন সন্তান আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় তিনি যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন, পরিস্থিতি এলোমেলো হয়ে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ৪ সন্তানের সার্বিক লালন-পালনের কাজ আরো দুরূহ হয়ে যাবে।
এমতাবস্থায় গর্ভপাত করা কি জায়েয হবে?

জবাব

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

শরীয়তের বিধান হলো যদি মহিলা অত্যাধিক দুর্বল হয়, যার কারণে গর্ভধারণ তার জন্য আশঙ্কাজনক হয় এবং গর্ভধারণের মেয়াদ চার মাসের কম হয়। তাহলে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক গর্ভপাত বৈধ হবে। মেয়াদ চার মাসের অধিক হলে কোনোভাবেই বৈধ হবেনা।

খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদির অভাবের কারণে সংসারকে সচ্ছল করার নিয়তে, দৈহিক সৌন্দর্য বা ফিগার ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে ,কন্যাসন্তান জন্ম নেয়ার ভয়ে (যাতে পরবর্তীতে এদের বিয়ে শাদীর ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়),অধিক সন্তান নেয়াকে লজ্জার বিষয় মনে করে গর্ভপাত বিশেষত অভাবের কারণে সংসারকে সচ্ছল করার নিয়তে গর্ভপাত করলে আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা রিজিকের মালিক আল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

.ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإيّاكم إنّ قتلهم كان خطأ كبيراً

''দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানকে হত্যা কর না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই খাদ্য প্রদান করে থাকি।নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ...''(সূরা ইসরা, আয়াত-৩১)

অন্যত্র তিনি বলেন, الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ . "শয়তান তোমাদের অভাবের ওয়াদা দেয়।" (সূরা আল-বাক্বারা)

আধুনিক যুগে ভ্রুণহত্যা জাহেলি যুগে কন্যাসন্তানকে
জীবন্ত সমাধিস্থ করার নামান্তর। তখন বাবা নিজ মেয়েকে গর্তে পুঁতে ফেলত; আর এখন আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা
মায়ের পেটেই শিশুকে মেরে ফেলা হয়। এ দুই হত্যার মধ্যে বাহ্যত কোনো তফাত নেই। এজন্য

রাসুলুল্লাহ (সা.) ভ্রুণহত্যাকে ‘গুপ্তহত্যা’ বলে উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘স্মরণ কর ওই
দিনকে, যেদিন জীবন্ত সমাধিস্থ নিষ্পাপ
বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাকে কোন অপরাধের কারণে হত্যা করা হয়েছে?’ (সূরা তাকয়ির :৮)।

,

★প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি বোন,
চার মাসের পূর্বে বিশেষ কিছু কারণে শরীয়ত গর্ভপাতকে অনুমোদন প্রদান করে থাকে।

(ক)বর্তমানে কোলে দুধের একটি শিশু রয়েছে,অপরদিকে উক্ত মহিলার গর্ভাশয়ে নতুন সন্তানও উৎপাদিত হচ্ছে। গর্ভের দরুন দুধ একেবারে শুকিয়ে গেছে।অপরদিকে উক্ত সন্তানকে অন্যকোনো উপায়ে লালনপালন করা যাচ্ছেনা। মায়ের দুধ ব্যতীত অন্যকিছুতে সে মূখই দিচ্ছে না।এমতাবস্থায় চারমাস হয়নি এমন গর্ভকে গর্ভপাত করা বৈধ রয়েছে।

(খ)কোনো মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তার উক্ত গর্ভবতী মহিলাকে পরিদর্শন করে বলে যে,গর্ভপাত না করলে মহিলার জান বা কোনো অঙ্গ বিনাশের আশঙ্কা রয়েছে।

★সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত ছুরতে গর্ভের সন্তানের বয়স কেবল আনুমানিক এক মাস হয়েছে,তাই এক্ষেত্রে যদি তার কোলে কোনো দুধের শিশু থেকে থাকে,আর গর্ভের দরুন দুধ একেবারে শুকিয়ে যায়,যার কারনে দুধের শিশুকে দুধ পান করাতে না পারে,তাহলেই কেবল প্রশ্নে উল্লেখিত মহিলা গর্ভপাত করতে পারবে।

নতুবা গর্ভপাত করা জায়েজ হবেনা।

9. **গর্ভপাত সম্পর্কে জানতে চাই।উল্লেখ্য আজকাল এগুলো মহামারী আকার ধারণ করেছে। একজন বলছেনন, যে ৯০ দিনের আগে তা করা যায়। সেটা কি ঠিক?**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
জবাবঃ
জন্মনিয়ন্ত্রণ বা এ্যাবর্শন(গর্ভপাত) সাধারণত চার ধরণের হয়ে থাকে।যথাঃ-

(১)(চিরস্থায়ী)জন্মনিরোধ পদ্ধতিঃ অর্থাৎ-এমন কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করা যার ফলশ্রুতিতে চিরস্থায়ীভাবে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।
(২)(অস্থায়ী)জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিঃঅর্থাৎ এমন কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করা যার ফলশ্রুতিতে সন্তান জন্মানোর ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকা সত্বেও বর্তমানে নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর সন্তান জন্ম নিবে না।
(৩)চারমাস পূর্বে গর্ভপাতঃ অর্থাৎ-গর্ভাশয়ে সৃষ্ট সন্তান চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে ঔষধের মাধ্যমে বিনষ্ট করে দেয়।
(৪)চারমাস পর গর্ভপাতঃ অর্থাৎ-গর্ভাশয়ে সৃষ্ট সন্তানকে চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পর ঔষধের মাধ্যমে বিনষ্ট করে দেয়া।
প্রথম প্রকারের হুকুমঃ
প্রথম প্রকার সর্বাবস্থায় নাজায়েজ ও হারাম।যদিও তাতে বাহ্যিকভাবে অনেক ফায়দা দৃষ্টিগোচর হয়?

দ্বিতীয় প্রকারের হুকুমঃ
দ্বিতীয় প্রকার শরীয়ত সম্মত প্রয়োজন ব্যতীত মাকরুহে তানযিহি।তবে শরীয়ত সম্মত নিম্নোক্ত প্রয়োজনে বৈধ রয়েছে।
(ক)মহিলা এত দুর্বল যে, গর্ভধারণের বর্তমানে যোগ্যতা নেই।
(খ)মহিলা নিজ বাসস্থান থেকে এত দূর সফরে যেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের আপতত কোনো মনোবাসনা নেই।আবার নিজ বাসস্থানে আসতেও কয়েক মাস লেগে যাবে বা কয়েক মাসের প্রয়োজন।
(গ)স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক সম্পর্ক চূড়ান্ত নিম্ন পর্যায়ের,এমনকি উভয়ের অন্তরে বিচ্ছেদের চিন্তাভাবনা চলছে।
(ঘ)পূর্বের বাচ্চার সু-সাস্থ্যর ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে।
(ঙ)স্থান-কালের ফাসাদ অর্থাৎ দ্বীনী পরিবেশের চূড়ান্ত পর্যায়ের অবনতির ধরুন বাচ্চা বদ-আখলাক বা অসচ্চরিত্র এবং মাতাপিতার বে-ইজ্জতির কারণ হবে বলে আশঙ্কা করলে।

বিঃদ্রঃ
সম্পদ কমে যাবে বা মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে সমাজে লজ্জিত হতে হবে মনেকরে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ কখনো বৈধ হবে না।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

জবাবঃ

জন্মনিয়ন্ত্রণ বা এ্যাবর্শন(গর্ভপাত) সাধারণত চার ধরণের হয়ে থাকে।যথাঃ-

(১)(চিরস্থায়ী)জন্মনিরোধ পদ্ধতিঃ অর্থাৎ-এমন কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করা যার ফলশ্রুতিতে চিরস্থায়ীভাবে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।
(২)(অস্থায়ী)জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিঃঅর্থাৎ এমন কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করা যার ফলশ্রুতিতে সন্তান জন্মানোর ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকা সত্বেও বর্তমানে নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর সন্তান জন্ম নিবে না।
(৩)চারমাস পূর্বে গর্ভপাতঃ অর্থাৎ-গর্ভাশয়ে সৃষ্ট সন্তান চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে ঔষধের মাধ্যমে বিনষ্ট করে দেয়।
(৪)চারমাস পর গর্ভপাতঃ অর্থাৎ-গর্ভাশয়ে সৃষ্ট সন্তানকে চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পর ঔষধের মাধ্যমে বিনষ্ট করে দেয়া।
প্রথম প্রকারের হুকুমঃ
প্রথম প্রকার সর্বাবস্থায় নাজায়েজ ও হারাম।যদিও তাতে বাহ্যিকভাবে অনেক ফায়দা দৃষ্টিগোচর হয়?

দ্বিতীয় প্রকারের হুকুমঃ
দ্বিতীয় প্রকার শরীয়ত সম্মত প্রয়োজন ব্যতীত মাকরুহে তানযিহি।তবে শরীয়ত সম্মত নিম্নোক্ত প্রয়োজনে বৈধ রয়েছে।
(ক)মহিলা এত দুর্বল যে, গর্ভধারণের বর্তমানে যোগ্যতা নেই।
(খ)মহিলা নিজ বাসস্থান থেকে এত দূর সফরে যেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের আপতত কোনো মনোবাসনা নেই।আবার নিজ বাসস্থানে আসতেও কয়েক মাস লেগে যাবে বা কয়েক মাসের প্রয়োজন।
(গ)স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক সম্পর্ক চূড়ান্ত নিম্ন পর্যায়ের,এমনকি উভয়ের অন্তরে বিচ্ছেদের চিন্তাভাবনা চলছে।
(ঘ)পূর্বের বাচ্চার সু-সাস্থ্যর ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে।
(ঙ)স্থান-কালের ফাসাদ অর্থাৎ দ্বীনী পরিবেশের চূড়ান্ত পর্যায়ের অবনতির ধরুন বাচ্চা বদ-আখলাক বা অসচ্চরিত্র এবং মাতাপিতার বে-ইজ্জতির কারণ হবে বলে আশঙ্কা করলে।

বিঃদ্রঃ
সম্পদ কমে যাবে বা মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে সমাজে লজ্জিত হতে হবে মনেকরে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ কখনো বৈধ হবে না।

তৃতীয় প্রকারের হুকুমঃ

তৃতীয় পদ্ধতি শরীয়ত সম্মত প্রয়োজন ব্যতীত নাজায়েজ ও হারাম।

বিশেষ কিছু কারণে শরীয়ত অনুমোদন প্রদান করে থাকে।

(ক)বর্তমানে কোলে দুধের একটি শিশু রয়েছে,অপরদিকে উক্ত মহিলার গর্ভাশয়ে নতুন সন্তানও উৎপাদিত হচ্ছে। গর্ভের ধরুন দুধ একেবারে শুকিয়ে গেছে।অপরদিকে উক্ত সন্তানকে অন্যকোনো উপায়ে লালনপালন করা যাচ্ছেনা। মায়ের দুধ ব্যতীত অন্যকিছুতে সে মূখই দিচ্ছে না।এমতাবস্থায় চারমাস হয়নি এমন গর্ভকে গর্ভপাত করা বৈধ রয়েছে।

(খ)কোনো মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তার উক্ত গর্ভবতী মহিলাকে পরিদর্শন করে বলে যে,গর্ভপাত না করলে মহিলার জান বা কোনো অঙ্গ বিনাশের আশঙ্কা রয়েছে।

চতুর্থ প্রকারের হুকুমঃ

চতুর্থ পদ্ধতি সর্বাবস্থায় নাজায়েজ ও হারাম।

তা কোনো অবস্থায়-ই বৈধ হবে না।

তৃতীয় প্রকারের হুকুমঃ

তৃতীয় পদ্ধতি শরীয়ত সম্মত প্রয়োজন ব্যতীত নাজায়েজ ও হারাম।

বিশেষ কিছু কারণে শরীয়ত অনুমোদন প্রদান করে থাকে।

(ক)বর্তমানে কোলে দুধের একটি শিশু রয়েছে,অপরদিকে উক্ত মহিলার গর্ভাশয়ে নতুন সন্তানও উৎপাদিত হচ্ছে। গর্ভের ধরুন দুধ একেবারে শুকিয়ে গেছে।অপরদিকে উক্ত সন্তানকে অন্যকোনো উপায়ে লালনপালন করা যাচ্ছেনা। মায়ের দুধ ব্যতীত অন্যকিছুতে সে মূখই দিচ্ছে না।এমতাবস্থায় চারমাস হয়নি এমন গর্ভকে গর্ভপাত করা বৈধ রয়েছে।

(খ)কোনো মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তার উক্ত গর্ভবতী মহিলাকে পরিদর্শন করে বলে যে,গর্ভপাত না করলে মহিলার জান বা কোনো অঙ্গ বিনাশের আশঙ্কা রয়েছে।

চতুর্থ প্রকারের হুকুমঃ

চতুর্থ পদ্ধতি সর্বাবস্থায় নাজায়েজ ও হারাম।

তা কোনো অবস্থায়-ই বৈধ হবে না।

10. স্বামী নিজের দ্বীন কে পরিপূর্ণ করতে। এবং দুইজন্য প্যাক্টিসিং হওয়ার লক্ষে বাচ্চাকে প্যাক্টিসিং ইসলামিক পরিবার দেওয়া লক্ষে বিয়ের পর বাচ্চা দেরিতে নেওয়া জায়েজ

হবে কি না। রিযিকের ভয় না করে দুইজনের বোঝাপড়া বাড়ানোর লক্ষে সন্তান দেরিতে নেওয়া জায়েজ হবে কি না?

জবাবঃ-

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

https://ifatwa.info/9675/ ফতোয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে,
ইসলাম মানুষকে অধিক সন্তানলাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছে এবং যে সব নারীরা অধিক সন্তানের প্রসবনী হয়ে থাকে, তাদের বিবাহ করতে নির্দেশ দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

"তোমরা অধিক সন্তানের প্রসবনী ও স্বামীদের অধিক ভালোবাসে এ ধরনের মেয়েদের বিবাহ কর, কারণ, কিয়ামতের দিন আমি আমার উম্মত বেশি হওয়ার কারণে আল্লাহর দরবারে গর্ব করব।" (আবু দাউদ, নাসায়ী। হায়াতুল মুসলিমিন, পৃষ্ঠা-১৮৯)

★★প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই বোন,
সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে সাধারণত জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

,
এক.স্থায়ী পদ্ধতি-যার দ্বারা নারী বা পুরুষ প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।
এই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ অবৈধ।

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (র.) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন: و هو محرم بالاتفاق অথাৎ স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন সর্বসম্মতক্রমে হারাম।(উমদাতুল ক্বারীঃ ১৪/১৪ পৃঃ)

দুই.অস্থায়ী পদ্ধতি- যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর কেউ প্রজনন ক্ষমতাহীন হয়ে যায় না। যেমন : আযল করা (সহবাসের চরম পুলকের মুহুর্তে স্ত্রীর যোনীর বাহিরে বীর্যপাত ঘটানো), Condom Jelly, Cream, Foam, Douche ইত্যাদি ব্যবহার করা, পিল (Pill) খাওয়া,জরায়ুর মুখ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া, ইঞ্জেকশন নেয়া ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার শরীয়ত সম্মত প্রয়োজন ব্যতীত মাকরুহে তানযিহি।তবে শরীয়ত সম্মত নিম্নোক্ত প্রয়োজনে বৈধ রয়েছে।

(ক)মহিলা এত দুর্বল যে, গর্ভধারণের বর্তমানে যোগ্যতা নেই।

(খ)মহিলা নিজ বাসস্থান থেকে এত দূর সফরে যেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের আপতত কোনো মনোবাসনা নেই।আবার নিজ বাসস্থানে আসতেও কয়েক মাস লেগে যাবে বা কয়েক মাসের প্রয়োজন।

(গ)স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক সম্পর্ক চূড়ান্ত নিম্ন পর্যায়ের,এমনকি উভয়ের অন্তরে বিচ্ছেদের চিন্তাভাবনা চলছে।

(ঘ)পূর্বের বাচ্চার সু-সাস্থ্যর ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে।

(ঙ)স্থান-কালের ফাসাদ অর্থাৎ দ্বীনী পরিবেশের চূড়ান্ত পর্যায়ের অবনতির ধরুন বাচ্চা বদ-আখলাক বা অসচ্চরিত্র এবং মাতাপিতার বে-ইজ্জতির কারণ হবে বলে আশঙ্কা করলে।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

،عن جابر قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه و سلم ـ صحيح البخاري –)2 /784(
باب العزل

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আযল(যা জন্ম নিয়ন্ত্রণের একটা পুরনো ও অস্থায়ী পদ্ধতি) করতাম। (বুখারী ২/৭৮৪)

★বিঃদ্রঃ

সম্পদ কমে যাবে বা মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে সমাজে লজ্জিত হতে হবে মনেকরে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ কখনো বৈধ হবে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإيّاكم إنّ قتلهم كان خطأ كبيراً.

দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানকে হত্যা কর না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই খাদ্য প্রদান করে থাকি।নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ…(সূরা ইসরা, আয়াত-৩১)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন,

. الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

"শয়তান তোমাদের অভাবের ওয়াদা দেয়।" (সূরা আল-বাক্বারা)

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে,আজকাল যদিও সন্তান হত্যার পরিবর্তে নানাবিধ উপায়ে তাদের জন্মের পর বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে, তবুও সন্তান জন্মানোর ফলে আর্থিক আশংকাজনিত ভুল ধারণা জন্মনিরোধের অন্যতম কারণ।

সুতরাং এবিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানকে ভেবে চিন্তে সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে,দুনিয়ার সামান্য ভোগবিলাস, কষ্ট বা লজ্জার ভয়ে আমরা যেন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ঈমান ও আখেরাতকে বরবাদ না করে দেই।

★সু-প্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই/বোন,
প্রশ্নে উল্লেখিত ছুরতে অস্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হারাম হবেনা।
তবে এটি মাকরুহে তানযিহি তথা অনুত্তম হবে।

হ্যাঁ যদি উপরোক্ত বৈধ পদ্ধতির মধ্যে কোনো একটা যদি এখানেও পাওয়া যায়,যেমন যদি মহিলা এত দুর্বল যে, গর্ভধারণের বর্তমানে যোগ্যতা নেই।
বা মহিলা নিজ বাসস্থান থেকে এত দূর সফরে যেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের আপতত কোনো মনোবাসনা নেই,বা স্থান-কালের ফাসাদ অর্থাৎ দ্বীনী পরিবেশের চূড়ান্ত পর্যায়ের অবনতির ধরুন বাচ্চা বদ-আখলাক বা অসচ্চরিত্র এবং মাতাপিতার বে-ইজ্জতির কারণ হবে বলে আশঙ্কা করলে অস্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েজ হবে।

11.সন্তান কখন বালেগ হয়?

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

জবাবঃ-

আলহামদুলিল্লাহ!

ছেলেদের বালেগ হওয়ার আ'লামত হল, স্বপ্নদোষ, বীর্যপাত, অথবা ছেলে এমন বয়সে উপনীত হওয়া যে, তার বীর্য গর্ভ ধারণ করার উপযুক্ত হয়ে গেছে। আর মেয়েদের বালেগা হওয়ার আ'লামত হল, স্বপ্নদোষ, হায়েয, এবং গর্ভ ধারণের সক্ষম হওয়া।

ছেলের বালেগ হওয়ার নিম্ন বয়স ১২ বৎসর এবং সর্বোচ্ছ ১৫ বৎসর। আর মেয়ের বালেগা হওয়ার বয়স সর্বনিম্ন ৯ বৎসর এবং সর্বোচ্ছ ১৫ বৎসর। এটা সাহেবাইন রাহ এর মাযহাব। এটাই সর্বাধিক পছন্দনীয়। ইমাম আবু হানিফা রাহ এর মতে ছেলেরা সর্বোচ্ছ ১৮ বৎসর বয়সে বালেগ হয় এবং মেয়েরা সর্বোচ্ছ ১৭ বৎসর বয়সে বালেগা হয়।

মোটকথাঃ-

বালেগ হওয়ার কয়েকটি আলামত রয়েছে যথা-

সাধারণত ১৫ বৎসর বয়স থেকে ছেলে বালিগ হয়।এবং ১৫ বৎসর বয়স থেকে মেয়ে বালিগ হয়।

তবে স্থান কাল ও খাদ্যাভ্যাস হিসেবে এর আগেও শারিরিক উন্নতি হয়ে বালিগ/বালিগা হতে পারে-

ছেলেদের বালেগ হওয়ার আলামত,বীর্যপাত হওয়া চায় ঘুমন্ত অবস্থায় হোক বা জাগ্রত অবস্থায়, এবং বীর্য এমন অবস্থায় গিয়ে পৌছা যে, উক্ত বীর্য দ্বারা গর্ভ ধারণ সম্ভব।

আর মেয়েদের বালিগ হওয়ার আলামত হল,স্বপ্নদোষ,হায়েয এবং গর্ভধারণের সক্ষমতা অর্জন করা।

এ আলামত গুলো যখনই পাওয়া যাবে তখনই বালেগ/বালেগা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

ملتقى الأبحر) :فصل في بيان أحكام البلوغ، 444/2، ط :دار إحياء التراث العربي(

يحكم ببلوغ الغلام بالاحتلام أو الإنزال أو الإحبال ...وببلوغ الجارية بالحيض أو الاحتلام أو الحبل، ...فإن لم يوجد شيء من ذلک فإذا تم لہ ثماني عشرة سنةً، ولها سبع عشرة سنةً عنده ... وعندهما إذا تم خمسة عشر سنةً فيهما، وهو رواية الإمام، وبہ قالت الأئمة الثلا ثة، وبہ يفتى وأدنى مدتہ لہ ثنتا عشرة سنة، ولها تسع سنين، الخ۔

:الدر المختار وحاشية ابن عابدين)رد المحتار( )6/ 153(

)بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال (والأصل هو الإنزال)والجارية بالاحتلام والحيض"
يتم لكل والحبل (ولم يذكر الإنزال صريحاً؛ لأنه قلما يعلم منها)فإن لم يوجد فيهما (شيء)فحتى
."منهما خمس عشرة سنةً، به يفتى (لقصر أعمار أهل زماننا

تبيين الحقائق) :فصل بلوغ الغلام، 275/6، ط :دار الكتب العلمية(
بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال، وإلا فحتى يتم له ثماني عشرة سنةً، والجارية بالحيض
... والاحتلام والحبل، وإلا فحتى يتم لها سبع عشر سنةً، ويفتى بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة
الخ-

:الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي)6/ 4472(
،البلوغ :يحدث البلوغ إما بالأمارات الطبيعية أو بالسن .أما الأمارات أو العلامات الطبيعية"
،فاختلفت المذاهب في تعدادها :فقال الحنفية :يعرف البلوغ في الغلام بالاحتلام، وإنزال المني
"وإحبال المرأة .والمراد من الاحتلام هو خروج المني في نوم أو يقظة، بجماع أو غيره

:الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي)6/ 4473(
"وأدنى مدة البلوغ للغلام اثنتا عشرة سنةً، وللأنثى تسع سنين، وهو المختار عند الحنفية"

قال الإمام القدوري سلسة المسئلة ٧١٧
قال أبو حنيفة :مدة البلوغ بالسن في الغلام ثماني عشرة سنة، وفي الجارية سبع عشرة سنة.وقال
أبو يوسف، ومحمد :في الغلام والجارية خمس عشرة سنة

(আল্লাহ-ই ভালো জানেন)

12.আসসালামুয়ালাইকুম।আমি আমার ছেলের নাম মুরসালিন বিন সালমান রেখেছি। কিন্তু পরে অনেকেই বলছেন নামটি রাখা উচিৎ নয়, এখন আমি কি করতে পারি?

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

ভালো নাম রাখা পিতা-মাতার সর্বপ্রথম দায়িত্ব। আমরা এভাবেও বলতে পারি যে, পিতা-মাতার উপর সন্তানের সর্বপ্রথম হক হচ্ছে, তার জন্য সুন্দর নাম নির্বাচন করা।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

.من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه

অর্থ : সন্তানের সুন্দর নাম রাখা ও তার উত্তম তারবিয়াতের ব্যবস্থা করা বাবার উপর সন্তানের হক। -মুসনাদে বাযযার (আলবাহরুয যাখখার), হাদীস ৮৫৪০

মানসিকতা ও স্বভাবের উপরও নামের একটা প্রভাব থাকে।

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، قَالَ :جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، فَحَدَّثَنِي :أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا :قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :مَا اسْمُكَ؟ قَالَ :اسْمِي حَزْنٌ، قَالَ :بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ .قَالَ .مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ :فَمَا زَالَتْ فِينَا الحُزُونَةُ بَعْدُ

আবদুল হুমাইদ বিন শায়বা বলেন, আমি হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের কাছে বসা ছিলাম। তিনি তখন বললেন, আমার দাদা 'হাযান' একবার নবীজীর দরবারে উপস্থিত হলেন। নবীজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? দাদা বললেন, আমার নাম হাযান। (হাযান অর্থ শক্তভূমি) নবীজী বললেন- না, তুমি হচ্ছ 'সাহল' (অর্থাৎ তোমার নাম হাযানের পরিবর্তে সাহল রাখো; সাহল অর্থ, নরম জমিন।) দাদা বললেন, আমার বাবা আমার যে নাম রেখেছেন আমি তা পরিবর্তন করব না। সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন, এর ফল এই হল যে, এরপর থেকে আমাদের বংশের লোকদের মেযাজে রুঢ়তা ও কর্কশভাব রয়ে গেল। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬১৯৩

সুন্দর নাম রাখার গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হল, হাশরের ময়দানে- সেখানে পূর্বাপর সকল মানুষ একত্রিত হবে এবং ব্যক্তিকে তার নাম ও তার বাবার নামসহ ডাকা হবে।

হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

.إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে ডাকা হবে তোমাদের ও তোমাদের বাবার নাম নিয়ে (অর্থাৎ এভাবে ডাকা হবে- অমুকের ছেলে অমুক)। তাই তোমরা নিজেদের জন্য সুন্দর নাম রাখ। - সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৪৮

13. **বাচ্চার নাম কি সাত দিনের দিনই রাখতে হবে নাকি বাচ্চা হওয়ার পর পরই রাখা যাবে? কোনটি করা উত্তম?**

বাচ্চার নাম রাখা নিয়ে দেখা যায় প্রায়ই নিকট আত্নীয়দের মধ্রে মতবিরোধ হয়। এক্ষেত্রে করনীয় কি?

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

জবাবঃ-

(১)

নাম সম্পর্কে মিশকাত কিতাবে উল্লেখিত কিছু হাদীস লক্ষণীয়--

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :»إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ :عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ« ."رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম নাম 'আবদুল্লাহ এবং 'আবদুর রহমান।সহীহ মুসলিম ৩৯-(৫৭০৯), তিরমিযী ২৮৩৩, আবূ দাঊদ ৪৯৪৯, ইবনু মাজাহ ৩৭২৮,

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :»لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا، وَلَا رَبَاحًا، وَلَا نَجِيحًا، وَلَا أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ :أَثَمَّ هُوَ؟ فَلَا يَكُونُ، فَيَقُولُ لَا« ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ .وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ، قَالَ " :»لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا، وَلَا يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا« ".

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনযির ইবনু আবূ উসায়দ যখন ভূমিষ্ঠ হলো, তখন তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আনা হলো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে নিজের রানের উপর রাখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ তাঁর নাম কী? উত্তরদাতা বলল : ''অমুক''। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ ''না''; বরং তাঁর নাম ''মুনযির''।সহীহ : বুখারী ৬১৯১, মুসলিম ২৯-(২১৪৯), তিরমিযী ২৩৮, ইবনু মাজাহ ২৭৫,

সুপ্রিয় প্রশ্নকারী দ্বীনি ভাই/বোন!
যেকোনো সময়ই নাম রাখা যাবে। তবে সাতদিনের সময় আকিকা করে নাম রাখা মুস্তাহাব।

বাচ্চার নাম রাখা নিয়ে যদি নিকট আত্নীয়দের মধ্রে মতবিরোধ হয়। তাহলে যে নামই কুরআন সুন্নহর নিকটবর্তী হবে,উলামাগণ সমর্থন দিবেন, মসজিদের ইমাম সাহেব সমর্থন দিবেন, সেই নামই রাখা শ্রেয়।

14. **মেয়ে বাচ্চার নাম মারইয়াম মুহাম্মাদ রাখা যাবে যদি বাবার নাম Md. Rafsan Jani হয়? মেয়েদের নামে নাকি মুহাম্মাদ লিখা যায়না? মারইয়াম মুহাম্মাদ রাখা যাবে?**

★★প্রিয় প্রশ্নকারী ভাই ভাই/বোন,
মেয়েদের নামে মুহাম্মাদ যুক্ত করার তেমন প্রচলন আমাদের সমাজে নেই,আর এটির প্রয়োজনীয়তা নেই।
তাই প্রশ্নে উল্লেখিত নাম রাখা হলে সমাজে প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে,তাই না রাখাই ভালো হবে।

তবে প্রশ্নে উল্লেখিত মেয়ে বাচ্চার এ ধরনের নাম রাখাতে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা নেই।
মারইয়াম মুহাম্মাদ নাম তার রাখা যাবে।

তথ্যসূত্র

-আদর্শ সন্তান গড়ার উপায় ও সন্তানের অধিকার
(মূল: হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দেদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) অনুবাদ: মাওলানা আলমগীর হুসাইন যশোরী)

- শিশুর মননে ঈমান(ড. আইশা হামদান)

-সহিহ বুখারি

-সহিহ মুসলিম

- আই ফতোয়া

- গ্রুপ:প্যারেন্টিং- শিশু লালন-পালন / শিশু শিক্ষা (জাহিদ হাসান - শিক্ষক, লেখক, কিডস এন্ড প্যারেন্টিং এক্টিভিস্ট)